ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ।। ২৪ শ্রাবণ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১০ আগস্ট, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

শিক্ষা বিলে বাম আপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। 'রাইট টু এডুকেশন' বিলের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়লেন রাজ্যের স্কুল-শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ দে।

পার্থ দে

দল ও সরকারের সমর্থন ছাড়া তিনি যে মুখ খোলেননি তা একরকম হলফ করে বলা যায়। কেন্দ্র সরকার সংসদের চলতি অধিবেশনে ক্যাবিনেট মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নিয়ে 'রাইট টু এডুকেশন' বিল পেশ করেছে। এরপরই রাজ্যসভাতেও পাস হয়ে গেছে। বিলের মূল কথা হল — (১) ৬ থেকে ১৪ বয়সের কেউই অশিক্ষিত বা নিরক্ষর

(এরপর ৪ পাতায়)

মন্ত্রিসভার রদবদল 'আই ওয়াশ' মাত্র

গুঢ়পুরুষ ।। বামফ্রন্টের দীর্ঘ ৩২ বছরের শাসনে ফ্রন্টের বড় শরিক সি পি এম দলের মন্ত্রীদের হাতে থাকা দপ্তরগুলিতে এই প্রথম সামান্য কিছু রদবদল করেছে। অথবা করতে বাধ্য হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে যদিও সাফাই দেওয়া হয়েছে, যে সব দলীয় মন্ত্রীদের হাতে একাধিক দপ্তরের দায়িত্বভার ছিল তাঁদের ভার লাঘব করতেই রদবদল করা হয়েছে। আলিমুদ্দিনের এই সাফাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। লোকসভার নির্বাচনে ভরাডুবির পর সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে মন্ত্রীদের কাজকর্ম নিয়ে কড়া সমালোচনা করা হয়। এইসব অপদার্থ মন্ত্রীদের সরিয়ে দিয়ে প্রশাসনে নতুন মুখ আনার দাবী জানানো হয়। সেই দাবী বিমান-বুদ্ধ-কারাত ত্রয়ী মানেননি। তাই সিপিএমের রাজ্যস্তরের নেতারা মন্ত্রীসভায় দলীয় মন্ত্রীদের কয়েকজনের দায়িত্বভার লাঘবের ঘটনাকে 'হাস্যকর রাজনৈতিক চমক' বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

দলীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সি পি এমের নেতারা রাজ্য কমিটির বৈঠকে সবচেয়ে বেশি অনাস্থা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনার প্রতি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-মঙ্গলকোট সর্বত্রই স্বৈরাচারী পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতা সিপিএমকে ডুবিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দলীয় সভায় সদর্পে বলছেন, বিরোধীদের মাথা ভেঙ্গে দেব। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধীরাই সিপিএমের মাথা ভেঙে দিচ্ছে। কথাটা মিথ্যা নয়। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট বরাদ্দের সমর্থনে বলতে গিয়ে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ২০০৬-০৮ এই তিন বছর সময়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে পশ্চিমবঙ্গে ১২৯ জন খুন হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৮০ জন সি পি এম সমর্থক কর্মী।

রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ মোট ১২৯ বার গুলি চালিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য ২০০৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ঘটা রাজনৈতিক সংঘর্ষের। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হানাহানি চরমে উঠেছে গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের ভরাডুবির পরেই। পঞ্চায়েত থেকে লোকসভার নির্বাচন সবক্ষেত্রেই বুদ্ধবাবু ও তাঁর অকর্মণ্য মন্ত্রীসভার জনবিরোধী কার্যকলাপ দলকে ডুবিয়েছে। মন্ত্রীসভার সদস্যদের প্রশাসন পরিচালনায় ব্যর্থতার দায় মুখ্যমন্ত্রীকেই নিতে হয়। বুদ্ধদেববাবু কিন্তু সেই দায় নিচ্ছেন না। তাছাড়া সরকারি এবং দলীয় সূত্রে বলা হচ্ছে, যেসব মন্ত্রীদের হাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছিল সে সব ক্ষেত্রেই কাজে গতি আনতে দপ্তর ছাঁটাই করা হয়েছে। এই কথার কোনও যুক্তিই নেই। কারণ, বুদ্ধবাবুর হাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আছে। তাঁর অধীনে প্রতিটি দপ্তরই ব্যর্থ। যেমন, সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, তথ্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে আছে। এইসব দপ্তরের কোনও একটিতেও মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিটি দপ্তরই অতিরিক্তভাবে আমলা নির্ভর এবং চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকা একাধিক দপ্তরের কোনও ছাঁটাই হয়নি। কেন? রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্রের এবং বিদ্যুৎ ও শ্রম মন্ত্রী মৃণাল বন্দোপাধ্যায়ের দপ্তরে ছাঁটাই হয়েছে। এই দুই মন্ত্রী তাঁদের দপ্তর পরিচালনায় সম্পূর্ণ অযোগ্য তা কোনও নতুন কথা নয়। কিন্তু সূর্যবাবুর ক্ষেত্রে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি মন্ত্রী হিসাবে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ডুবিয়েছেন। অথচ তিনিই স্বাস্থ্য মন্ত্রী রইলেন। মৃণালবাবু শ্রম দপ্তর নয়, ডুবিয়েছেন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টনকে। রাজ্য জুড়ে যে ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয় চলছে তা মৃণালবাবুর অযোগ্যতার জন্য। কিন্তু তিনিই বিদ্যুৎমন্ত্রী বহাল রইলেন। তাই মন্ত্রিসভার রদবদলকে 'আই ওয়াশ' ছাড়া আর কী বলা যায়!

মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ড

'মকোকা' খারিজ, মুক্ত প্রজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মালেগাঁওয়ের বিস্ফোরণ তদন্তে পিছুই হটতে হলো মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা এ টি এস-কে! গত ৩১ জুলাই বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং, সেনা অফিসার এস পি পুরোহিত সহ ১১ জন অভিযুক্তের ওপর থেকে মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অরগাইনাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট (এম সি ও সি এ)-এ আনা মামলা খারিজ করে দিল বিশেষ আদালত। ছাড় পেয়ে গেলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার রমেশ উপাধ্যায়, সমীর কুলকার্নি, অজয় একনাথ রাইকার, জগদীশ চিন্তামণি, রাকেশ দত্তরাম ধাওয়াদেও। বিচারপতি ওয়াই ডি সিন্ধে জানিয়েছেন, এবার থেকে এই মামলার শুনানি চলবে নাসিকের দায়রা আদালতে। ফলে ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্ত নতুন মোড় নিল।

গত ১১জুলাই সাধ্বী প্রজ্ঞা চিঠি দিয়ে সংবাদমাধ্যমকে জানায় যেপুলিশ, হাসপাতাল, জেল কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছে। ফলে এরপর বাইকুলা জেলের মধ্যেই তাঁকে আত্মহত্যা করতে হবে। প্রজ্ঞার আইনজীবী নবীন ছোমাল অভিযোগ করেন, 'উগ্রপন্থী আজমল কাসভ যদি জেলে জামাই আদর পায় তবে সাধ্বী পাবেন না কেন? তিনি তো 'হিন্দু মতাদর্শে বিশ্বাসী!'

ঘটনা ক্রমশ অন্যদিকে মোড় নিচ্ছিল। কিছুদিন আগেই মুম্বাই পুলিশ দাবি করেছিল সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংয়ের আইনজীবীকে খুন করার ছক তারা ভণ্ডুল করে দিয়েছে। আর তারপরেই এম সি ও সি এ-র বিচারপতি ওয়াই ডি সিন্ধে মুম্বাই পুলিস কমিশনারকে উদ্দেশ্য করে চিঠিতে লেখেন, তাঁকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এর পরেই ১৬ জুলাই পুলিশ কমিশনার ডি শিবানন্দন সাংবাদিকদের জানান, বিচারপতি ওয়াই ডি সিন্ধের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের মুক্তির জন্য ক্রমশ চাপ বাড়ছিলই।

শিবসেনার মুখপত্র 'সামনা'-য় সম্পাদকীয় কলামে বাল থ্যাকারে তো লিখেছিলেন, গোটা হিন্দু সমাজ রয়েছে প্রজ্ঞা, অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার রমেশ উপাধ্যায়, সমীর কুলকার্নির সঙ্গে। 'ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যদি আফজল গুরুকে প্রশ্রয় দিতে পারি তবে সাধ্বী প্রজ্ঞা, রমেশ উপাধ্যায়, সমীর কুলকার্নিকে নিয়ে গর্ব করবো না কেন?' সেদিন থ্যাকারের দাবী ছিলো, 'মালেগাঁও বিস্ফোরণ যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সকলেই সংস্কৃতি ও শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িত। তাদের গ্রেপ্তার করার অর্থ মুসলিম তোষণের জন্য হিন্দু নিধন'।

সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংকে ধরার পর মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্ত প্রতিদিন নিত্য নতুন মোড় নিয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার ওয়াই ডি সহস্রবুদ্ধে ও মেজর রমেশ শিবাজী উপাধ্যায়ের সঙ্গে এই কাণ্ডে জড়ানো হয়েছিল নাসিকের সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে চলা ভোঁসলা মিলিটারি স্কুলের কমান্ডান্ট এ ই রাইকারকে। এই স্কুলেরই আরেক প্রাক্তন কমান্ডান্ট মেজর প্রভাকর কুলকার্নিকেও জড়ানো হয়েছে মালেগাঁও কাণ্ডে। মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা (এ টি এস) সূত্রে জানা গেছে, উপাধ্যায় সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতো। অবসর সময়ে সে নাকি ছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কর্মীদের অস্ত্র প্রশিক্ষক। প্রজ্ঞা ও তার দুই সহযোগীকে উপাধ্যায় নাকি বোমা বানাতে শিখিয়েছিল। আর প্রভাকর কুলকার্নির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কী অভিযোগ তা অবশ্য তদন্তের স্বার্থে কখনও প্রকাশ্যে জানায়নি এ টি এস।

অভিনব ভারত সংস্থানের কর্ণধার প্রাক্তন সেনাকর্মী সমীর কুলকার্নি যিনি প্রজ্ঞার সঙ্গেই মুক্তি পেয়েছেন, তিনি মহারাষ্ট্রের আদি বাসিন্দা।

মকোকা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে এখন নাসিক আদালতে মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্ত ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির

(এরপর ৪ পাতায়)

অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে তারাপীঠ

সংবাদদাতা ঃ বীরভূম ।। তীর্থপীঠ তারাপীঠ ক্রমশ বহিরাগত অপরাধীদের 'স্বর্গরাজ্য' হয়ে উঠছে। ভিড় বাড়ায়, বহিরাগত তীর্থযাত্রীদের সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে জেলা পুলিশ। আর এই নিরাপত্তার ফাঁক গলে হোটেল, শ্মশান চত্বরে বাড়ছে মদ, গাঁজা, জুয়ার আড্ডা। এমনকী বসছে মধুচক্রের আসর। নানা সামাজিক অপরাধের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হচ্ছে এখানে বসেই।

রামপুরহাটের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সি সুধাকর জানান, তারাপীঠে বহিরাগত তীর্থযাত্রীদের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। আরও কিছু পরিকল্পনা নেওয়ার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা চলছে। যাতে বহিরাগত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

তারাপীঠের বিভিন্ন হোটেলে গত দু-তিনবছরে কমপক্ষে আট-দশটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের রেকর্ডে সবগুলিই আত্মহত্যা বলে চিহ্নিত হলেও বাস্তবে সেইসব মৃত্যুর ঘটনার ভিতরে গভীর রহস্য রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে আসা জাল নোট তারাপীঠ এলাকা থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে জেলা জুড়ে।

তারাপীঠ জুড়ে কি কি ঘটনা ঘটছে তার খতিয়ান শুনলে চমকে উঠতে হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বহিরাগত অপরাধী ও অপরাধ জগতের পান্ডারা তারাপীঠকে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়ে এখানে লুকিয়ে থেকে রাজ্যে বড় বড় অপরাধের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করছে। সেই সঙ্গে চলছে জাল নোটের রমরমা কারবার। তারাপীঠ লাগোয়া শ্মশানে সমাধি দেওয়া মৃতদেহ তুলে বহিঃরাজ্যে পাচার হচ্ছে শ্মশানের কঙ্কাল। সাধুবেশে আত্মগোপন করে থাকছে বহু অপরাধী। আত্মহত্যার মোড়কে হচ্ছে খুন। তারাপীঠ জুড়ে এহেন

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

এ টি এম থেকেও জাল নোট সতর্ক করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কয়েক মাস আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল জালনোটের রমরমা। পরিস্থিতির মোকাবিলায় জনচেতনা সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞাপনও দেয় ব্যাঙ্ক। বাসে-ট্রামে বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝানো হয়েছিল আসল নোট চেনার কলা-কৌশল। এতে অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হলেও, স্থায়ী সমাধান হয়নি। জালনোটের কারবারীরা তাদের ব্যবসা চালিয়ে গেছে। গত মাসেই মহারাষ্ট্র থেকে ৯ লাখ টাকার জালনোট উদ্ধার করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও দেশজুড়ে নতুন করে জালনোটের রমরমায় চিন্তিত। জাল নোট রোধে গঠিত নায়ক কমিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৬৯ হাজার কোটি (১,৬৯,০০০) টাকার জাল নোট বাজারে ছড়িয়ে আছে।

জাল নোটের কারবারীরা এতটাই সংঘটিত যে, সমস্যার সমাধানে গোয়েন্দা বিভাগও হিমশিম খাচ্ছে। জল এতটাই গড়িয়েছে যে আসল নোটের সঙ্গে জাল নোটের পার্থক্য বের করা সাধারণ মানুষের পক্ষে একরকম অসম্ভব। চোখে দেখে, সব লক্ষণ মিলিয়েও সাধারণ মানুষ তা নকল কিনা বুঝে উঠতে পারছে না। শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের মেশিনেই তা ধরা পড়ছে। তাও তা ব্যাঙ্কের সঙ্গে আদান-প্রদানের সময়। অবস্থা বেগতিক বুঝে বেশিরভাগ দোকানদার পাঁচশো, হাজার টাকার নোট নিতে চাইছেন না। দিল্লীর বুকেও

ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের কাছ থেকে খুচরো টাকা দাবী করছেন। দিল্লীর ব্যবসায়ী সমিতি এই ঘটনায় ব্যবসায়ীদের পাশেই দাঁড়িয়েছে। জাল নোটের রমরমা থেকে রেহাই পাচ্ছে না এটিএম কাউন্টারগুলিও। দেশের ইতি-উতি এটিএম কাউন্টার থেকে প্রায়ই জালনোট বের হবার ঘটনা ঘটছে। ফলে বিপত্তি আরও বেড়েছে। সেই সঙ্গে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তিও ছড়াচ্ছে। কেরলের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি দেখা গেছে। কেরলের অনেকেই এটিএম-এর কারবার কমিয়ে চেকের মাধ্যমে কাজ সারছেন। এ কে নায়ার নামে এক সরকারি চাকরিজীবীর মতে, এটিএমও যখন জাল নোটের শিকার, তখন সরাসরি ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবারই ভালো। ছত্তিশগড়ের পেট্রোল পাম্প মালিকরা সমস্যা থেকে বাঁচতে সরাসরি পাঁচশো টাকার নোট নিতে অস্বীকার করেছেন। একই রাস্তা নিয়েছে বেসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাও। তারা নকল নোটের দায়ভার শিকার করবে না বলে জানিয়েছে। এমনকী নিজের ব্যাঙ্কের এটিএম থেকেও না। এবিষয়ে তারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেওয়া গাইড লাইনে চলার নীতি নিয়েছে।

এদিকে এসবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এটিএম-এ টাকা লোডের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছু পরীক্ষা করেই করা হচ্ছে বলে দায় সেরেছে। ফলে এতে সমস্যার সমাধানের আশাও কম।

দেশজুড়ে গজিয়ে ওঠা এই কারবারের ভিতও কম শক্ত নয়। প্রাথমিকভাবে এর পিছনে আই এস আই-এর যোগসাজস রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই সমস্ত টাকা তৃতীয় দেশগুলিতেও অর্থাৎ থাইল্যান্ড, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস্ এর মতো দেশেও ছড়াচ্ছে। এর সঙ্গে থাইল্যান্ড আরব দেশগুলি হয়ে নেপাল, শ্রীলঙ্কা চলে যাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বাংলাদেশও। একটা নকল হাজার টাকার নোট তৈরি করতে খরচ পড়ে মাত্র চারশ টাকা। অনেকের মতে বান্ডিল বান্ডিল টাকা করতে মানুষও এই প্রলোভনে পা দিচ্ছে। মহারাষ্ট্রে গ্রেপ্তার হওয়া জাল নোটের কারবারীদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে আসল নোটের ৯৫ শতাংশ ফিচারই তাদের জানা। ফলে অনায়াসে সূক্ষ্ম নকল নোট তৈরিও তাদের কাছে অসম্ভব কিছু নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তাদের পর্যন্ত নকল নোট দেখে ভিরমি লেগে যাচ্ছে। পাঁচশ, হাজার টাকার নোটের অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য খালি চোখে দেখা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে যে বিজ্ঞাপনের ওপর ভরসা করে মানুষ এতদিন আসল টাকা চিনেছে, তাও অকেজো হয়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, সমস্যার সমাধানে আরও সতর্ক ভূমিকা নিচ্ছে গোয়েন্দারা। সেই সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও।

এই সময়

সামাজিক দায়বদ্ধ তা

সত্যিই তিনি ব্যতিক্রমী মুখ্যমন্ত্রী। উন্নয়ণই তাঁর প্রধান পরিচয়। পরিবেশ দিবসের দিনও এমনই পরিচয় রাখলেন নরেন্দ্র মোদী। গত ২ আগস্ট গুজরাটে যান চলাচল না করার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন তিনি। সেই মতো এদিন রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গাতেই সাইকেল চালিয়ে 'পরিবেশ দিবস' পালন করল রাজ্যবাসী। পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। জনগণও উন্নয়ণের স্বার্থে তা সুষ্ঠুরূপে পালন করেন। রাজ্যবাসীদের সামাজিক দায়বদ্ধ তা দেশের মানুষের কাছে একটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। এদিন স্কুল পড়ুয়ারা মোদীর মুখোশ পরে শহরে বের হয়।

ভোটার লতা

ভোটার হলেন লতা মঙ্গেশকর। চমকাবেন না। কোনও গুজব নয়। সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর ভারতীয় হলেও, এতদিন ভোটার তালিকায় নাম ছিল না তাঁর। বিভিন্ন কারণে ভোটের পরিচয়পত্র তৈরি করেননি এতদিন। সম্প্রতি এই গুরু দায়িত্বটি সেরেছেন তিনি। জেলার সহকারী নির্বাচনী অফিসার সঞ্জয় ভগত সাংবাদিকদের এই খবর জানান। তবে লতা মঙ্গেশকর এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বোঝা নয়

৬ বছরের বেশি বয়সী প্রতিবন্ধীদের জন্য আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করল মধ্যপ্রদেশ সরকার। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পাশাপাশি মানসিক রোগীরাও এই টাকা পাবে। তারা যাতে অন্যের বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় — এই লক্ষ্যেই সরকার এই যোজনা হাতে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এ জন্য সহায়তা অনুদান যোজনা গঠন করেছেন। এই যোজনার মাধ্যমেই প্রতিবন্ধীদের মাসে ৫০০ টাকা অনুদানের কথা ঘোষণা করা হয়।

সাপের লেখা

কথায় বলে বাঘের দেখা, সাপের লেখা। সাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন কল্প কথা থাকলেও, সম্প্রতি এক তথ্যে জানা গেছে যে, সমগ্র বিশ্বে ২১৬ প্রজাতির সাপ রয়েছে। ভিন্ন প্রজাতির সাপের বৈশিষ্ট্যও এক এক রকম। এর মধ্যে ৫২ প্রজাতির সাপ রয়েছে ভারতে। খরিশ, চিতি সাপের পাশাপাশি ৫০ প্রজাতির সাপ এদেশে রয়েছে। এদেশের অনেকেই সাপের সব প্রজাতির সঙ্গে পরিচিত নয়।

খবরের খবর

সকালে চায়ের কাপের সঙ্গে আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী নিশ্চয় কোনও না কোনও দৈনিক পত্রিকা। তাহলে জেলার পত্রিকারা কি দোষ করল। আপনি জেলার কাগজ পড়ুন আর না পড়ুন, জেলা কাগজের সংখ্যাটাও কম নয় এই রাজ্যে। পশ্চিম-বঙ্গের ১৯ জেলা থেকে ১১ হাজার ছোট পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ পায়। এর মধ্যে কয়েকটি জেলায় কিছু জেলা দৈনিকও রয়েছে। যেমন কাঁথির দৈনিক চেতনা। ভারতীয় সংবাদপত্রের সাগরে এই কাগজগুলিও এক একটি বিন্দু।

পুরুষতান্ত্রিক

আইন বিদ্যাও কি পুরুষতান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। এই আশঙ্কায় এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে দেশের মহিলা বিচারপতিদের। ভারতের ৬১৭ জন হাইকোর্টের বিচারপতির মধ্যে মাত্র ৪৫ জন বিচারপতি রয়েছেন মহিলা। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রে চিত্রটা আরও উদ্বেগজনক। ২৪ জন বিচারপতির সকলেই পুরুষ। এলাহাবাদের ৭৩ জন বিচারপতির মধ্যে ৭০ জন পুরুষ, ৩ জন মহিলা। অন্ধ্রপ্রদেশের ৩১ জন বিচারপতির মধ্যে ২৯ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। মুম্বাইতে ৬৬ জন বিচারপতির মধ্যে ৫৯ জন পুরুষ, ৭ জন মহিলা। দিল্লীতে ৩৯ জন বিচারপতির মধ্যে ৩৩ জন পুরুষ, ৬ জন মহিলা। এমন চিত্র প্রায় সব রাজ্যেই। এই রাজ্যও বাদ নেই। কলকাতার হাইকোর্টের ৩৮ জন বিচারপতির মধ্যে মহিলা বিচারপতি মাত্র ২ জন।

নগ্ন সত্য

এ কী শুধু নিন্দা নাকি সত্যকে স্বীকার। এমন কথা-ই উঠে আসছে বুদ্ধি জীবীদের কাছে। সামরিক বাহিনীর নিম্নপদের কর্মচারীদের অফিসারদের ঘরের কাজে নিয়োগ করার ঘটনার নিন্দা করল কেন্দ্র সরকার। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি এই নিন্দা করেন। তাঁর মতে নিম্ন পদের হলেও, তাঁদের কেবল অফিসের কাজেই ব্যবহার করা উচিত। এ ধরনের ঘটনা হলে ব্যবস্থা গ্রহণেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। তবে তাঁর এই মন্তব্যে পরোক্ষে ইউপিএ জমানার দৈন্যদশার চিত্রই প্রকট হল বলে মনে করছেন বুদ্ধি জীবীদের একাংশ।

অবাধে পাচার

শুধু গোরু নয়, বাংলাদেশে এখন পাচার হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি থেকে কুকুরও। মোটা টাকার লোভে কোনও কিছুই বাদ রাখছে না পাচারকারীরা। উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ, বাগদা, স্বরূপনগর, বসিরহাট, হাসানবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ সীমান্ত হয়ে পাচার হচ্ছে এসব। এমন কী বাদ থাকছে না কুকুরছানাও। ময়না, টিয়া, লালমোহন সব ধরনের পাখিই বাংলাদেশে চোরা পথে পাচার করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে ডালসেসিয়ান, চাইনিজবাগের মতো প্রজাতির কুকুর ছানাও টাকার বিনিময়ে পাচার হচ্ছে। সব জেনেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। ফলে অবাধেই চলছে গোরুর পাশাপাশি কুকুর থেকে নানা ধরনের পশু-পাখির পাচারও।

কন্যা চাই

চীনের পরিবার কল্যাণের সমীকরণে এবার নতুন সংযোজন 'কন্যা চাই'। অবস্থা এমনই মোড় নিচ্ছে চীনের ক্ষেত্রে। এর কারণও অবশ্য বিশ্ব জোড়া মন্দাই। কয়েক বছর আগে জন্ম নিয়ন্ত্রণে এক সন্তানের পক্ষে জনসচেতনা বাড়ানো হয়েছিল। এখন মন্দার হাত থেকে বাঁচতে মেয়ে সন্তানই চাইছেন বেশিভাগ অভিভাবক। এক সরকারি সমীক্ষাতেই দেখা যাচ্ছে মেয়ে সন্তানের দিকে হিসাবের পাল্লা ভারী। পুত্র সন্তানের পারিবারিক খরচাপাতি থেকে জীবন-যাপনের অনান্য খরচা মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে ছেলের থেকে মেয়ের দিকেই ঝুঁকছেন অধিকাংশ পিতা-মাতা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাঙ্ঘাতিক ভুল ও তাহার মাসুল

মিশরের শার্ম এল শেখ-এ ভারত পাক যৌথ বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশ জুড়িয়া বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছিল। সেই ঝড়ের ধারা সামলাইতে পাকিস্তান সম্পর্কে নিজের সরকারের নীতির সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং সংসদে দাঁড়াইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা ওই সাংঘাতিক ভুলের পর আরও একটি সাংঘাতিক ভুল। পাকিস্তানের নিকট হইতে শান্তি ক্রয়ের প্রচেষ্টাতে আমাদের দেশের কয়েকটি মেট্রো শহরের সংবাদ মাধ্যম অবশ্য আশাবাদী। ভারত-পাক শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমই আগাইয়া চলিবার সর্বোত্তম উপায় বলিয়া তাহারা পথ বাতলাইয়াছেন। কথা হইল, মুম্বাই-এ ২৬।১১ ঘটনার পরও পাকিস্তানের কাজকর্মের ধারাটি কি তাহারা একবার খতাইয়া দেখিবেন? পাকিস্তান নিজেদের ভূমি হইতে সন্ত্রাসবাদীদের এই রকম আক্রমণ প্রতিহত করিবার কোনও উদ্যোগ কি লইয়াছে? কেহ কি তাহা আমাদের দেখাইতে পারেন? আমাদের কি পাকিস্তানের মুখের কথাকেই শুধু বিশ্বাস করিতে হইবে, বিশেষতঃ যখন তাহারা এইসব সন্ত্রাসবাদীদেরকে "রাষ্ট্রহীন নায়ক" (স্টেটলেস অ্যাক্টরস) বলিয়া উপস্থাপনের চেষ্টা করিতেছে? আই এস আই পৃষ্ঠপোষিত এই সব দৈত্যদেরকে শুধুমাত্র ভারতকে আক্রমণ করিবার জন্যই মদত দিয়া চলিতেছে? পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী রহমান মালিক যখন জামাত-উদ-দাওয়া-র প্রধান হাফিজ সইদ-এর সম্পর্কে অপপ্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তখন ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার কি কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছিল? মুম্বাই আক্রমণে জড়িত শুধু এই অভিযোগে সইদকে নাকি গ্রেপ্তার করা যায় না, কেননা পাকিস্তানের মন্ত্রীর বক্তব্য হইল — 'শুধু শোনা কথার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা আমাদের নাগরিককে গ্রেপ্তার করিতে পারি না। মুম্বাই হামলার সহিত সম্পর্কিত বহু নথিপত্র সাক্ষ্য প্রমাণাদি দেওয়ার পর পাক অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর এই উক্তি যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। শার্ম এল শেখ-এর সাঙ্ঘাতিক ভুলের পর সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে পাকিস্তানের সহিত তাঁহার সরকারের অবস্থান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং যখন ব্যাখ্যা দিতেছেন, ঠিক ইহার একদিন আগে রহমান মালিক জিও নিউজ চ্যানেলে সইদ সম্পর্কে নিজেদের এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। লস্কর-এ -তৈবা (এল-ই-টি)-র প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদ-এর মতো নাগরিক-কে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতকে বাধিত করিবার ইচ্ছা নাই বলিয়া পাকিস্তানী মন্ত্রী যখন বয়ান দিতেছেন, তখন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং তাহার মমার্থ লইয়া প্রশ্ন তুলিয়া পাকিস্তানকে মুখের মতো জবাব কেন দিলেন না? পাকিস্তান এখন আই এস আই মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের আজ 'রাষ্ট্রহীন' ও আগামীকাল 'নাগরিক' বলিয়া চিহ্নিত করিতেছে, বিভিন্ন শব্দজাল সৃষ্টি করিয়া বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের দেশে নিরন্তর সন্ত্রাসবাদী রপ্তানী করিয়া চলিয়াছে। অথচ কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার সব কিছু মানিয়া লইতেছে নাকি এই আশায় যে পাকিস্তানের সহিত একদিন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। এই অক্ষম সরকারকে আর কী বলিবার আছে।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং পাকিস্তানকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে "নিজে ধ্বংস হইবার আগে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে দমন করুক।" প্রশ্ন হইল, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সতর্কবাণী পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারসহ কতজন পাকিস্তানীর মনযোগ আকর্ষণ করিয়াছে? আমরা যখন পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদ দমনের কথা বলি তখন 'সন্ত্রাস' সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাহা বলি। প্রতিবেশী দেশ কীভাবে ভারতকে দিনের পর দিন রক্তাক্ত করিবার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এদেশের স্থিতিশীলতাকে বিচলিত করিবার জন্যই যে তাহা করিতেছে — সেই কথা স্মরণে রাখিয়া বলি না। পাকিস্তানে হাফিজ সইদ-এর মতো সন্ত্রাসবাদীকে 'ভালো সন্ত্রাসবাদী' বলা হইতেছে। যাহারা নির্বিচারে নিরীহ মানুষকে খুন করিয়া থাকে তাহাদের যে ভালো খারাপ হয় — এই তত্ত্ব এখন পাকিস্তান নিজেদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। কেননা 'ভালো সন্ত্রাসবাদীরা' পাকিস্তানের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিবে না। আল-কায়দা-তালিবানদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইতেছে তাহা একরূপ বাধ্য হইয়াই। কেননা মার্কিন নেতৃত্বে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে পাকিস্তান একজন অংশীদার। অন্যদিকে আমরা যখন পাকিস্তানকে সন্ত্রাস দমনের কথা বলি, তখন তাহা বলিবার জন্যই যেন বলি, নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকিয়া তাহা বলি না। এবং একারণেই তাহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। এখন স্পষ্টভাবেই বলিতে হইবে — আই এস আই যাহা পাকিস্তানে সরকারের মধ্যেই একটি সরকার এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রশ্নাতীত নিয়ন্ত্রক — সেই এজেন্সীটিকে অবিলম্বে ধ্বংস করিতে হইবে। কেননা ভারতের বিরুদ্ধে ছায়া যুদ্ধ চালাইবার জন্য আই এস আই বছরের পর বছর ধরিয়া সন্ত্রাসবাদের দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে। যতদিন না সোজাসুজি ও স্পষ্ট ভাষায় এই কথা বলা যাইবে ততদিন ইসলামাবাদ দিল্লীর কোনও কথাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিবে না। এখন সেই সময় যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী অনুভব করিতেছেন যে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক বিষয়ে তাঁহার ধ্যান-ধারণা বা দর্শন মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর বরং এখন প্রাক্তন বিদেশ সচিব কানোয়াল সিবাল-এর মতো কূটনীতিবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার যিনি পাকিস্তান সম্পর্কে অত্যন্ত সঠিক কথাই বলিয়াছেন। শ্রী সিবালের বক্তব্য ছিল — আমাদের শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ ভারতের শান্তির ধ্যান-ধারণা পাকিস্তানের নীতি-নির্ধারকদের আলোড়িত করে না। ফেরিওয়ালার মতো শান্তি ফেরি করা নয়, ব্যবহারিক হওয়া দরকার। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী জাতি হিসাবে ভারতের উত্থানে পাকিস্তানের এই নীতি নির্ধারকেরা বিচলিত বোধ করিতেছে এবং এই কারণে ভারতের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

আদালত ও মার্কসবাদী নেতারা

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

তাপসী মালিকের হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সুহৃদ দত্ত ও দেবু মালিক কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ায় দলীয় কর্মীরা তাঁদের বীরের সম্মান দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁরা বেকসুর খালাস পাননি, পেয়েছেন জামিন। তবু শঙ্খ বেজেছে, লাল আবীরে কর্মীরা মাখামাখি করেছে, হয়েছে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান।

নেতারা আদালতের জয়গান গেয়েছেন, জানিয়েছেন আদালতে সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। দাবী করা হয়েছে যে, তাঁদের রাজনৈতিক কারণে ফাঁসানো হয়েছে। তপন-শুকুর মুক্তি পাওয়াতেও বিচারককে সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

কেউ দোষী, কি নির্দোষ — সেটা নিয়ে আমরা একটা কথাও বলব না। সেই অধিকার আমাদের আদৌ নেই — সেটা নির্ধারণের দায়িত্ব আদালতেরই। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা একটা অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। সেটা হল বিচারবিভাগকে রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনা। এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আদালতের রায় আমাদের নেতাদের পক্ষে গেলেই আইন-আদালতের প্রশস্তি গাওয়া হয়, আর কোনও রায় পছন্দ না হলেই গালমন্দ করা হয় বিচারপতিদের। রাজনৈতিক নেতাদের এই দ্বিচারিতা ক্রমে সাধারণ মানুষের মনে আদালতের ভূমিকা নিয়ে একটা সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করা হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই।

উদ্বেগের সঙ্গে দেখছি — কোনও আদালত মায়াবতী বা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে বা রায় দিলে, যাঁরা আদালতকে সত্যের পূজারী বলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান, তাঁরাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তাঁদের দল বা সরকার তিরস্কৃত হলে। তাহলে বিচারকদেরও 'আমরা' ও 'ওরা'-র সেই বিভাজনের মধ্যে টেনে আনা হল?

১৮৯৪ সালের একটা বৃটিশ আইনের মাধ্যমে সিঙ্গুরের কৃষি-জমি দখল করা হয়েছে টাটার মোটর শিল্পের জন্য। এটাকে কলকাতা হাইকোর্ট বৈধতা দেওয়ায় আমাদের তথাকথিত বাম-নেতারা আদালতের বিজ্ঞতা নিয়ে ধন্য ধন্য রব তুলেছিলেন। অথচ সিঙ্গুর নিয়ে বারবার ১৪৪ ধারা জারি বা তাপসী মালিকের ব্যাপারে সি বি আই তদন্তের ব্যাপারে হাইকোর্টের রায় সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়ায় আদালতের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন সেই নেতারাই। কোনও কোনও নেতা অশালীন ভাষায় বিচারপতিদের আক্রমণ করেছেন। কেউ ব্যাঙ্গাত্মকভাবে তাঁদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, কেউ অভিযোগ করেছেন — আদালত বিরোধী দলের হয়ে কাজ করছে।

অত্যন্ত উদ্বেগের ব্যাপার হল — কখনও বিচারকদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করা হয়, কখনও আবার বদলির নামে তাঁদের চাপ সৃষ্টি করা হয়। মনে পড়ছে ২০০৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট একটা মামলা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল যে, এই রাজ্যের স্বাস্থ্য-পরিষেবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছিল অম্ল-মধুর তিরস্কার। সেই বছরেই অফিস সময়ে মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ করে একজন মাননীয় বিচারপতি রায় দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করা হয়েছিল। একজন বড় নেতার হাইকোর্টে দন্ড হয়েছে — কিন্তু আপীল মামলাটা এখনও ঝুলে আছে সুপ্রীম কোর্টে। আমরা জানতেই পারলাম না — সাধারণ মানুষ যেটা করলে শাস্তিটা অবশ্য প্রাপ্য নেতাদের ক্ষেত্রে তার ছাড় আছে কিনা।

আরও মজার কথা সেই বিচারককে বদলি করা হয়েছে অন্য রাজ্যে। এটা স্বাভাবিক বদলি, নাকি কেন্দ্রের তৎকালীন বন্ধু সরকারের বদান্যতায় বাম-সরকারের উদ্বেগ-হ্রাসের ব্যবস্থা, সেটা জানি না। একজন বিচারপতির রায়ে বারবার পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষকদের গাফিলতি ধরা পড়ছিল, তাঁকেও বদলি করা হয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কেও তো এখন পার্টির শাখা-অফিস বানানোর চেষ্টা চলছে।

অবশ্য হাইকোর্টের বিচারপতিদের চাকরির শর্তে বদলির কথাও আছে। সংবিধানের ২২২ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারপতিদের অন্য হাইকোর্টে বদলি করতে পারেন — অবশ্য 'রাষ্ট্রপতি' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের ক্যাবিনেটের ব্যাপারটাই বুঝে নিতে হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে এটা বিচারপতিদের ওপর চাপ সৃষ্টির একটা প্রয়াস, সেটা তাঁদের অনেকে ধরে নিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় — ১৯৮১ সালে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কে বি এন সিং-কে মাদ্রাজ হাইকোর্টে বদলি করা হলে সুপ্রীম কোর্টে একটা মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু ওই আদালত জানিয়েছিল যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারপতির সম্মতি নেওয়ার দরকার নেই, আর এর জন্য ভারতের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ অনুসারে সরকার চলতেও বাধ্য নয়। সুতরাং শাস্তিমূলক বদলির সুযোগটা থেকেই গিয়েছে। কেন্দ্রে বন্ধু-সরকার থাকলে রাজ্য সরকার এটা কাজে লাগাতেই পারে।

কিন্তু আরও বিপজ্জনক ব্যাপার হল পছন্দসই রায় ঘোষিত না হলেই বিচারপতির বিরুদ্ধে নিন্দাবাদটা। অবশ্যই আমাদের সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলো হল 'কোর্ট অফ্ রেকর্ড।' ১২৯ নং অনুচ্ছেদে আছে — কোর্ট অফ্ রেকর্ড হিসেবে অন্যকে নিজের অবমাননার কারণে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে — "..... shall have the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself"। প্রায় অনুরূপ ভাষাতে ২১৫ নং অনুচ্ছেদেও হাইকোর্টগুলোকে 'কোর্ট' অফ্ রেকর্ড' হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা নিজেদের অবমাননার জন্য যে কোনও ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারেন।

"প্রতিবাদী মহিলাকে ধর্ষণ ও হত্যা করার পর নেতারা ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী রটিয়ে তাঁর ব্রাহ্মমুহূর্তে আত্মহত্যা ও ধর্ষণের তত্ত্ব বানাবে আর পুলিশ গোয়েন্দাদল প্রভুভক্ত সারমেয়-এর মতো তা মেনে নেবে — এটা মার্কসবাদীদের প্রগতিশীল শাসনে চলে, কিন্তু আদালতও সেটা বিনা বাক্যে গ্রহণ করবে কেন? সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদ শান্তিপূর্ণ মিছিল মিটিং করার অনুমতি দিয়েছে। অথচ বুদ্ধিজীবীদের সেই সুযোগ থাকবে না — এটাও আদালত মার্কসীয় গণতন্ত্রের নামে গিলে নেবে?"

তবু দেখা গিয়েছে কোনও কোনও মন্ত্রী বা নেতা আদালত বা বিচারপতি সম্বন্ধে অশোভন মন্তব্য করেছেন, কেউ কেউ অবশ্য ভুলবশত বা আবেগ-বাহুল্যের ফলেও আদালত অবমাননা করেছেন। মনে পড়ছে, সংবিধানের প্রথম সংশোধনের আগে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ডঃ বি আর আম্বেদকর আদালত সম্বন্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। ছানা সংক্রান্ত একটা বিবৃতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন আদালত অবমাননার দায়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা দুঃখপ্রকাশ করায় ব্যাপারগুলো মিটে গিয়েছিল। কিছুকাল আগে প্রয়াত মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পি সি বরুয়া সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় উক্ত বিচারপতি জানিয়েছিলেন — এই ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সরকারের দু'টো বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করার জন্যই এই বিষয়টার তিনি ইতি টানতে চান।

কিন্তু মনে হয়, এই ব্যাপারে সবচেয়ে জঘন্য অন্যায় করে চলেছেন কিছু মার্কসবাদী নেতা। নন্দীগ্রামের ব্যাপারে সাংবাদিক, বিরোধী নেতা — এমনকী সমাজসেবী বুদ্ধিজীবীদের আটকানোর জন্য বারবার সরকার ১৪৪ ধারা জারি করায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ (গিরীশ চন্দ্র গুপ্ত, তপন কুমার ব্যানার্জীর) নিন্দা করেছিল। সেখানে পুলিশ-ক্যাডারের যৌথ বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল — নিহত হয়েছিলেন অন্তত ১৪ জন, আহতের সংখ্যা ছিল শতাধিক। প্রধান বিচারপতি এস এস নিজ্জর ও বিচারপতি পি সি ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ

(এরপর ৪ পাতায়)

আদালত ও মার্কসবাদী নেতারা

(৩ পাতার পর)

এটাকে [illegible] বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁদের রায়ে বলা হয়েছিল — 'The firing cannot be justified under any provision of the law'.

এইসব রায় নিয়ে অনেক বাম-নেতা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মতে, এতে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়বে। কেউ কেউ বলেছিলেন — আদালতই তাহলে দেশ শাসন করুক। একজন বলেছিলেন — পুলিশের কাজ হল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা — ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে বা গঙ্গাজল ছিটিয়ে সেটা হয় না। অনেক নেতা হাইকোর্টের বাড়াবাড়ি নিয়ে অশালীন বক্তব্যও করেছিলেন। কেউ আবার চেয়েছিলেন আদালতের সীমা নির্ধারিত করে নিতে।

অবশ্যই প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী, ভগবতীপ্রসাদ ব্যানার্জী, সুশান্ত কুমার চ্যাটার্জী, দিলীপ বসু প্রমুখ গুণীজন এই প্রবণতার তীব্র নিন্দা করেছেন। কিন্তু তাতে কি এই মেকী-বিপ্লবীদের চৈতন্যোদয় হবে?

আসল প্রশ্ন হল — নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও তান্ডবকেও কি আদালত মেনে নিতে বাধ্য? ডঃ হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, আইনসভায় স্বেচ্ছাচারিতা — বিশেষ করে শাসনবিভাগের স্বৈরাচারকে ('Arbitrariness of the executive') প্রতিরোধ করাই আদালতের প্রধান কাজ (ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স)। ১৯৯১ সালের ২৬ নভেম্বর এক ভাষণে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়ও জানিয়েছিলেন, আদালতের কর্তব্য হল ক্ষমতার অপব্যবহারকে প্রতিহত করা — 'কারণ আদালত হল, যেখানে হাজার হাজার কৃষককে জীবিকাচ্যুত করে শিল্পপতির পুঁজি বাড়ানোর জন্য কৃষি-জমি লুঠ করার চেষ্টা চলছে। সেখানে প্রতিরোধ হবেই — সেটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ-ক্যাডারের বাহিনী নির্মমভাবে গুলি চালাবে? প্রতিবাদী মহিলাকে ধর্ষণ ও হত্যা করার পর নেতারা ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী রটিয়ে তাঁর ব্রাহ্মমুহূর্তে আত্মহত্যা ও ধর্ষণের তত্ত্ব বানাবে আর পুলিশ গোয়েন্দাদল প্রভুভক্ত সারমেয়-এর মতো তা মেনে নেবে — এটা মার্কসবাদীদের প্রগতিশীল শাসনে চলে, কিন্তু আদালতও সেটা বিনা বাক্যে গ্রহণ করবে কেন? সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদ শান্তিপূর্ণ মিছিল মিটিং করার অনুমতি দিয়েছে। অথচ বুদ্ধিজীবীদের সেই সুযোগ থাকবে না — এটাও আদালত মার্কসীয় গণতন্ত্রের নামে গিলে নেবে?

আর আদালত তার সীমা হারিয়েছে কিনা, সেই বিচারও করবে স্বল্প শিক্ষিত নেতারা? ডঃ অনুপচাঁদ কাপুর লিখেছেন — উচ্চ আদালতের কাজ হল To interpret the constitution and determine the law' - (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম)। সেক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইন ও সংবিধান লঙ্ঘন করেছে কিনা, উচ্চ আদালতই সেটা নির্ধারণ করে। তাহলে কি ইতিমধ্যে সংবিধান বদল করে লেখা হয়েছে যে, নেতারাই সংবিধান ব্যাখ্যা করে দেখবেন উচ্চ আদালতগুলো তাদের এক্তিয়ারে বাইরে চলে গিয়েছে কিনা। ডঃ আম্বেদকর, ডঃ মুন্সী প্রমুখ সংবিধান-রচয়িতারা জীবিত থাকলে এদের শ্রীচরণে গড় হতেন কি?

১৯৭০ সালে সি পি আই (এম)-নেতা ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে মন্তব্য করেছিলেন যে, বিচারপতিরা বিত্তবান শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে সব সময়ই সর্বহারা বা প্রলেটারিয়েতদের বিরুদ্ধে রায় দেন — 'Judges are guided and dominated by class-hatred, class-interests and class-prejudices....। কেরল হাইকোর্ট তার অর্থদণ্ড করায় তিনি সুপ্রীম কোর্টে আপিল করেছিলেন। প্রধান বিচারপতি মহম্মদ হিদায়াতুল্লা কিন্তু অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন এই উচ্চমার্গীয় তত্ত্ব। তাছাড়া প্রশ্ন উঠেছিল — ন্যায়-বিচারের জন্য উক্ত নেতা সুপ্রীম কোর্টে গেলেন কেন? সেখানকার বিচারপতিরা শ্রেণী চরিত্রের উর্দ্ধে! দিল্লী-এশিয়াডের সময় তো আদালত শ্রমিকদের পক্ষেই রায় দিয়েছিল, আর প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি এন ভগবতীর মতে, জনস্বার্থ মামলায় দেখা হয়েছে 'Poor masses'-এর স্বার্থ।

আসল কথা হল, নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে যখন যাওয়া যায়, তখন বিচারকদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করা কেন? আমরা তো জানি কোনও রায় নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা যায়, কিন্তু বিচারকদের উদ্দেশ্য বা সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাবের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট জানিয়েছিল, পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকার ধ্বংস করার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে পারে না। ১৯৯৫ সালে সুপ্রীম কোর্ট মুখ্য নির্বাচন-কমিশনার ও অন্য দুই কমিশনারকে একই আসনে বসিয়েছিল। এগুলো নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্ক হয়েছে, সমালোচনা হয়েছে — কিন্তু বিচারককে গালিগালাজ করা হয়নি। ডঃ এস এল সিক্রি মন্তব্য করেছেন, 'Denigration of the judiciary by men at the helm of affairs must be discouraged' (দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশান)। কিন্তু রায় স্বমতে এলে আদালতকে অভিনন্দন জানানো আর বিপক্ষে গেলে বিচারকের মুন্ডুপাতের ঐতিহ্য মার্কসবাদীদের রাজনীতিতে চলতে থাকবে বলেই মনে হয়। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ পাল্কীওয়ালা লিখেছেন, 'while it is desirable to inject justice into politics, it is dangerous to inject politics into justice.' এই কথাটি বোঝা দরকার নয় কি?

মকোকা খারিজ

(১ পাতার পর)

আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনসান) অ্যাক্ট এবং এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেনস অ্যাক্ট অনুযায়ী সেশন কোর্টে অভিযুক্তরা এখন জামিন চাইতে পারেন, যার সুযোগ তারা এতদিন পাননি। পরিস্থিতির এই পরিবর্তন মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ডি এফ সরকারকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কেননা গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন বিরোধীদলগুলির বিরুদ্ধে তারা এই মামলাটাকে নিজেদের ভোটের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিল। মহারাষ্ট্রের গৃহমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নসিম খান এই মর্মে তাই জানিয়েছেন আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই রায়ের বিরুদ্ধে মুম্বাই হাইকোর্টে আপীল করা হবে।

বিশেষ আদালতের এই নির্দেশ এ টি এস-এর সেইসব তদন্তকারী অফিসারদের গালে কষে চড় মারার মতো বলে মন্তব্য করেছেন পুরোহিতের আইনজীবী শ্রীকান্ত সেভদে। এখন নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত, এ টি এস মকোকা আইনের শর্তগুলি অপব্যবহার করেছে। তাই এ টি এস-এর হাত থেকে এই আইন প্রয়োগের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া দরকার। মকোকা কোর্টে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ২০০৯-এর ২০ জানুয়ারি এ টি এস যে ৪৫২৮ পৃষ্ঠার চার্জসীট দাখিল করেছিল, তাতে অভিযোগ করা হয়েছিল, পুরোহিতের লক্ষ্য হল ইস্রায়েলের সাহায্য নিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তৎকালীন এ টি এস-এর কার্যকরী প্রধান কে পি রঘুবংশী এই মামলাকে খাড়া করতে আরও বলেছিলেন, দেশে যা চলছে তা মোকাবিলা করার সামর্থ্য ভারতীয় সংবিধানের নেই। তাই পুরোহিত হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। এবং এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি ইস্রায়েলের সাহায্য চাইবেন। পুরোহিতের আইনজীবী শ্রী সেভদের মন্তব্য এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। তিনি বলেছেন, মকোকা আইনটি সংগঠিত অপরাধীদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করার কথা। কিন্তু তা যে হয়নি বিশেষ আদালতের রায়েই তা প্রমাণিত। অভিযুক্তদের মধ্যে এমন একজনও নেই যাদের একজনের বিরুদ্ধেও দশ বছরে মধ্যে কোনও ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য

(১ পাতার পর)

সব কান্ডের বেশ কিছু ক্ষেত্রে জেলা পুলিশ ব্যবস্থাও নিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বহিরাগত অপরাধীরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে আশ্রয় নিয়েছিল তারাপীঠে। বারুইপুরের গৃহবধূ খুনের হত্যাকারীকে তারাপীঠ থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির-এর মূর্তি চুরির দলের দুই পান্ডা তারাপীঠে এসে সাধুর বেশে আত্মগোপন করেছিল।

পুলিশ পরে তাদের গ্রেপ্তার করে। কলকাতার সল্টলেকের ছাত্রী রোমার অপহরণকারী দলের এক পান্ডাকে তারাপীঠে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারাপীঠের এক হোটেলে সোনাগাছির এক মক্ষীরাণী নৃশংসভাবে খুন হয়। কলকাতার এক শিশু অপহরণকারীকেও তারাপীঠ থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারাপীঠে হামেশাই মদ্যপ অবস্থায় মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে। বহিরাগত অপরাধীরা টাকার জোরে তারাপীঠে মাসের পর মাস আস্তানা গেড়ে থাকছে। রামপুরহাটে ব্যাঙ্ক ডাকাতির মূল পান্ডারা তারাপীঠে বসে ব্যাঙ্ক ডাকাতির নকশা তৈরি করেছিল বলে পুলিশ মহলের ধারণা। তারাপীঠ শ্মশানে মৃতদেহ পোড়ানোর সময় মৃতের ডেথ সার্টিফিকেট দেখা হয় না বলে অভিযোগ। ফলে খুন করে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার আশঙ্কা থেকেই যায়। তারাপীঠ জুড়ে চলছে ঢালাও সুদের কারবার। রামপুরহাটের এস ডি পি ও সি সুধাকর বললেন, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে হোটেল, ব্যবসায়ী সমিতি, মন্দির কমিটি, শ্মশান কমিটি, অটোরিক্সা চালক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চলে। হোটেলগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। তারাপীঠের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় লাগানো হয়েছে সিসি টিভিক্যামেরা। হোটেলে বহিরাগত তীর্থযাত্রীদের তালিকা নিয়মিত চেকআপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারাপীঠ ফাঁড়ির পুলিশ-এর সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।

শিক্ষা বিলে বাম আপত্তি

(১ পাতার পর)

থাকবে না, (২) কোনও শিশুকেই নির্দিষ্ট প্রাথমিক পরীক্ষা পাসের আগে ফেল করানো, বরখাস্ত বা বহিষ্কার করা চলবে না, (৩) নির্দিষ্ট প্রাথমিক স্তর (অষ্টম শ্রেণী) উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একটি সার্টিফিকেট দিতে হবে, (৪) এই বিল জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া সারা ভারতে প্রযোজ্য হবে, (৫) প্রত্যেক প্রাইভেট স্কুলে ২৫ ভাগ আসন আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য প্রথম শ্রেণীতে (class I) সংরক্ষিত রাখতে হবে, (৬) শিক্ষাদানের মান উন্নত করতে হবে, (৭) স্কুলের শিক্ষকদের যথাযোগ্য পেশাগত ডিগ্রি পাঁচ বছরের মধ্যে অর্জন করতে হবে। তা না হলে তিনি বাতিল হবেন এবং (৮) শিক্ষার আর্থিক ব্যয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে বহন করবেন।

ঘটনা হল, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই সি পি এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের এই আপত্তি।

গত চারবছর ধরে এই বিল সংসদে ঝুলে ছিল। মানব সম্পদ উন্নয়ণ দপ্তরের মন্ত্রী কবিল সিবাল বলেছেন, সরকার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে শিক্ষার সুফল পৌঁছে দিতে সচেষ্ট। এন ডি এ জমানায় মানব সম্পদ উন্নয়ণ দপ্তরের তৎকালীন মন্ত্রী ডঃ মুরলীমনোহর যোশী ৬ থেকে চৌদ্দ বছরের সকল বালক-বালিকাকে সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে এনে সাক্ষর করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বামমোর্চা সরকারের স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ দে-র কথায় 'শিক্ষা' একান্তই রাজ্যের বিষয়। এখানে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ করা উচিৎ নয়। তাছাড়া খরচের পুরোটাই কেন্দ্রকেই দিতে হবে বলে তাঁর দাবী। স্কুলের পরিকাঠামো, শিক্ষকের যোগ্যতার শর্তেও পার্থবাবুর অমত রয়েছে। তাঁর অভিযোগ — কেন্দ্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থাটাই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত আইন রূপায়িত হলে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো কি কি থাকবে তা কেন্দ্র ঠিক করে দেবে। এতে সবচেয়ে বিপদে পড়তে চলেছে সিপিএম। কেননা, পরিকাঠামোর ব্যাপারে সবচেয়ে অসুবিধায় পড়বে পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়া ছাত্রসংখ্যা অনুসারে শিক্ষকের অনুপাত, শ্রেণীর হিসেবে ক্লাসঘরও কম রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

পার্থবাবু আগবাড়িয়ে বলছেন, বিলটি গৃহীত হলে শিক্ষাব্যবস্থার যাবতীয় খরচ রাজ্যকেই বহন করতে হবে। অথচ বিলে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ে মিলে আর্থিক দায়িত্ব বহনের কথা বলা হয়েছে।

রাজ্য রাজনীতি

প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ

ছন্নছাড়া বিশৃঙ্খল অবস্থা রাজ্যের

নিশাকর সোম

বিগত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের বিপুল সাফল্যের পর কয়েকটি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে — যেমন, (১) জমি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বিল আনতে তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছেন মমতা ব্যানার্জী। (২) প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে চান তা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। (৩) নদীয়ার কালিগঞ্জের পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তৃণমূল-বিজেপি বাম দলের সাহায্যে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। (৪) উলুবেড়িয়াতে কংগ্রেস সিপিএম সহ অন্যান্য দলের সাহায্য নিয়ে পুরবোর্ড গঠন করেছে। (৫) মনোনয়ন পত্র পেশের শেষ দিন পর্যন্ত শিয়ালদহ বউবাজার কেন্দ্র নিয়ে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের ঐক্যমত দেখা গেল না। অনেক টানা পোড়নের পর শেষপর্যন্ত হয়েছে।

এখানে আরও উল্লেখ্য বিষয় হল শিয়ালদহ কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে সোমেন-জায়া শিখা মিত্রের মনোনয়ন পেশ। এই কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের মনে হয়েছিল যে, এই কেন্দ্রে সোমেনবাবুর দীর্ঘদিনের সহচর বাদল ভট্টাচার্য প্রার্থী হবেন। তা হয়নি। আদতে সোমেন মিত্রের প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেস বস্তুত তৃণমূলে বিলীন হওয়ার পথে যাচ্ছে। ইতিহাস কী নির্মম। এই সোমেন মিত্রকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত না করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মমতাদেবী। মমতা পরাজিত হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন। আর আজ সোমেন মিত্র মমতাদেবীর বদান্যতায় আপ্লুত। একথা ঠিকরাজনীতিতে কোনও কথা শেষ কথা নয়।

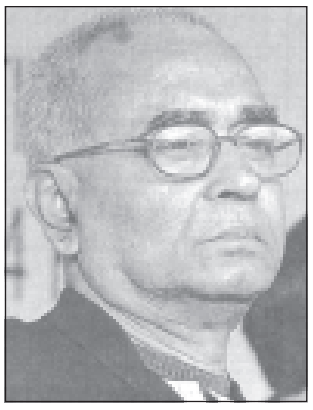

রেজ্জাক মোল্লা

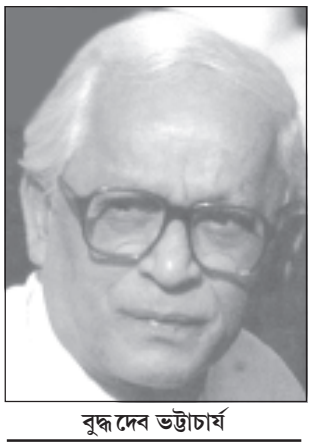

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নিরুপম সেন

ঠিক সেইভাবেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের মধ্যে আজ সম্পর্কের তিক্ততা চরম পর্যায়ে উঠে গেছে। রাজ্যে জমি সংগ্রহ এবং জেলাওয়ারি জমি মানচিত্র তথা ভূমি পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব — সবই বুদ্ধবাবুর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নীতির সব থেকে কঠোর সমালোচক ভূমি এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার হাতে দেওয়া হয়েছে। এদিকে এই রেজ্জাক মোল্লা আলিমুদ্দিনে বসেই বলেছেন, "জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হাইব্রিড নেতাদের সরিয়ে দিয়ে চাষী মজুর ঘরের তরুণদের নেতা করা হোক।" রেজ্জাক মোল্লা একসভায় জনসাধারণকে সম্বোধন করে বলেছেন, "মনিব বহুদিন তোমাদের ঘাম-জল খেয়েছি, আর টানতে পারছি না।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১ ও ২ আগস্ট সিপিএমের রাজ্য কমিটির সভা। সভায় মূলত লোকসভা ভোটেবিপর্যয়ের পর্যালোচনার-রিপোর্ট পার্টির নিম্নস্তরে যেটা আলোচনার সারাৎসার — তাই নিয়ে চর্চা হওয়ার কথা। এই সভায় মন্ত্রিসভার এবং পার্টি নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্য নির্বাচনী বিপর্যয় চলার সঙ্গে সঙ্গে নীচের তলার কর্মীদের ঔদ্ধত্য, মস্তানি, প্রমোটারদের দালালি করা এবং তোলা আদায়, যে কোনও কাজে ধনীদের কাছ থেকে টাকা আদায় ইত্যাদি কাজেরও কথা উঠবে। রেজ্জাক মোল্লা, তড়িৎ তোপদারদের মতো নেতারা চাষী-মজুরদের স্বার্থ না দেখার জন্যও সমালোচনায় মুখর হবেন না। এখন সিপিএমের নেতৃত্বের 'সসেমিরা' অবস্থা, 'কিংকর্তব্য বিমূঢ়' বিহ্বল। পার্টির সর্বস্তরেই নেতৃত্বের প্রতি কোনও বিশ্বাস নেই। পার্টির কোনও নেতা জোর করে কিছু বলতে সাহস করেন না। কোনওক্রমে দিনগত পাপক্ষয়। কিছু কনভেনশন করে কর্মীদের মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। এই চেষ্টা ফলবতী হবে না, যদি না ব্যর্থ নেতৃত্বের অপসারণ হয়।

কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? কারণ সবাই তো কম-বেশি একই অপরাধে অপরাধী। সমগ্র পার্টিতেই ঘুন ধরে গেছে। এতে উৎসর্গীকৃত কর্মী ধীরে ধীরে বসে যাবেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনকে আঁটোসাঁটো করার জন্য সিপিএমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিমান বসু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন। তখন আলোচনায় আসে অসুস্থ মন্ত্রীদের বসিয়ে নতুনদের আনার। কিন্তু পার্টির মধ্যে এমনি দলাদলি যে, কোনও জেলা থেকে অসুস্থ মন্ত্রীকে বাদ দেওয়ার কথা বলা যাবে না। উদাহরণ দেওয়া যায় — বিতর্কিত মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী খুবই অসুস্থ। তাঁকে বাদ দিলে উত্তর ২৪ পরগণার সুভাষ গোষ্ঠী পার্টির মধ্যে "কর্মবিরতি"র ডাক দেবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএমের অবস্থা ছন্নছাড়া, পিতৃ-মাতৃহীন সংসারের মতো। কেউ কাউকেই মানে না। বুদ্ধ বাবু-বিমানবাবু দুই মেরুতে। বর্ধমান জেলা পার্টি নিরুপম-বিনয় কোঙার-এর পৃষ্ঠপোষিত। নিরুপমবাবু বিমান-বুদ্ধ দু-জনকেই মনে করেন অদক্ষ ব্যর্থ।

আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, মন্ত্রী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য। তিনি মনে করেন রাজ্য পর্টির কৃষক ফ্রন্টের নেতারা ঘরে বসে তত্ত্ব কপচাচ্ছে। তারা কৃষকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই কৃষকরা পার্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন।

এছাড়া পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের নীচের তলার কর্মীরা মনে করেন সিটুর রাজ্য নেতারা রাজনৈতিকভাবে স্থবির। আন্দোলন না করার ফলে শ্রমিকরা সিটুকে আর সংগঠন মনে করেন না।

অন্য রকম

জীবনসঙ্গী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সমাজে আজও কন্যা দায় বড় দায়। তার ওপর ছেলে বা মেয়ে প্রতিবন্ধী হলে, সন্তানও বোঝা মনে হয় মা-বাবার। তাহলে উপায়! উপায় বলতে নিয়তিই শেষ রাস্তা। ভূপালবাসীদের (মধ্যপ্রদেশ) অবশ্য এই দায় থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন মুকেশ বৈরাগী। শত শত পিতাকে কন্যাদায় থেকে তিনিই মুক্ত করছেন। প্রতিবন্ধী সন্তানদের বিয়ে দিতে তিনিই ভরসা। প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েরাও বুঝে গেছেন তাঁদের মুকেশদা যখন আছেন, তখন বিয়ে একদিন না একদিন হবেই। মূক-বধির যুবক-যুবতীদের কাছে তিনি যেন প্রজাপতি ঋষি। গত পাঁচ বছর ধরে মুকেশ বৈরাগী এই কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছেন। তথাকথিত ঘটকের মতো তিনি নন। টাকার লোভে ধরে ধরে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার ফন্দিও তিনি করেননি। শুধু প্রতিবন্ধীদের সাচ্চা দোস্ত হবার বাসনাতেই এই কাজে হাত লাগান তিনি। কেবল হিন্দু বা মুসলিম নয়, সব সম্প্রদায়, সব সমাজের ছেলে-মেয়েদেরই বিবাহ দেন মুকেশ। পদ্ধতিটাও বেশ বিচিত্র ধরনের। 'পরিচয় সম্মেলন' নামে এক সম্মেলনের মাধ্যমেই বিয়ে পাকা করা হয়। পঞ্চাশ টাকার রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে যোগ দিতে হয় সম্মেলনে। এই সম্মেলনেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হরেক পাত্র-পাত্রী হাজির হয়। প্রতিবন্ধী পাত্র-পাত্রীরা এখান থেকেই খুঁজে পান তাঁদের জীবনসঙ্গী। প্রতিবন্ধীরা তাঁদের নিজেদের স্বভাবসুলভ অভ্যাসের দ্বারা সহজেই মনের মতো সঙ্গীকে বেছে নিতে পারেন। এভাবেই ঠিক হয় লাইফ-পার্টনার। তবে এখানে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর অনেক মা-বাবাই উৎসব করে বিয়ে দেন। অনেক ছেলে-মেয়েও চায় বিয়ের পিঁড়িতে বসতে।

এভাবেই হয় বিয়ে। সম্মেলনের একটি চিত্র।

'যদিদং হৃদয়ং তব। তদিদং হৃদয়ং মম'— বলার সৌভাগ্যটাও তারা মুকেশ বৈরাগীর দৌলতেই লাভ করে।

সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জীবনসঙ্গী খুঁজে দিতে পেরে মুকেশও গর্বিত। সমাজের এই কাজটুকু করতে পেরে তিনিও নিজেকে ধন্য মনে করেন। আবার অনেক প্রতিবন্ধীও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পায়।

আফগান ফেরত তালিবানরা জোট বাঁধছে বাংলাদেশে

গাফফার খান চৌধুরী ।। বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আফগান ফেরত যোদ্ধারা একত্রিত হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীসহ এদেশের তিনটি ইসলামী দল এতে মদত দিচ্ছে। তাদের নির্দেশেই দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে তারা সংগঠিত হচ্ছে। গ্রেফতার হওয়া দুই শীর্ষ জঙ্গি নেতার সঙ্গে ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শীর্ষ জঙ্গি নেতা ওবায়দুল্লাহ্‌র সঙ্গে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় কারাগারে থাকা হুজি প্রধান মুফতি হান্নানের প্রায় ২৩ বছরের সুসম্পর্ক। গোয়েন্দা সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি, সমরাস্ত্র ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ মুফতি হাবিবুল্লাহ ওরফে মনসুর আলিকে ৭ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ।

শীর্ষ জঙ্গি নেতা ও সমরাস্ত্র বিশেষজ্ঞ হাবিবুল্লাহ গোয়েন্দাদের জানায়, জীবনে টাকা-পয়সা বড় নয়, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করাই মূল লক্ষ্য। কওমী মাদ্রাসায় মাত্র ৩ হাজার টাকায় বেতনে চাকরি করত হাবিবুল্লাহ। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বেতন না দিলেও তার কোনও আফসোস ছিল না। ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পক্ষে যে কোনও ধরনের কার্যক্রম চালাতে তারা প্রস্তুত। এমন মনোভাব থেকেই মুফতি ফজলুল হক আমিনীসহ বাংলাদেশের বহু জে এম বি (জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ) ও হুজি নেতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইসলামী আইন বাস্তবায়নের সূত্র ধরে ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনীর সঙ্গে সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া দুই জঙ্গির যোগাযোগ ছিল। মুফতি ওবায়দুল্লাহ ও মুফতি হাবিবুল্লাহর সঙ্গে মুফতি ফজলুল হক আমিনীর কথা হতো বলে গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে।

হাবিবুল্লাহর মোবাইল ফোনের কললিস্টে মুফতি ফজলুল হক আমিনীর সঙ্গে কথা বলার রেকর্ড রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের আরও ৭ জে এম বি ও হুজি নেতার সন্ধান পেয়েছেন গোয়েন্দারা। সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে হাবিবুল্লাহর মোবাইল ফোনে বাংলাদেশের অন্তত ৭ জঙ্গি নেতার নাম সেভ করা রয়েছে। কললিস্টে যাদের নাম রয়েছে, তাদের মধ্যে মুফতি ফজলুল হক আমিনী একজন। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এক জরুরী গোপন বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। এর বিপক্ষে যারা অবস্থান নেবে তাদের হত্যা করা হবে। সে যেই হোক না কেন, দুই শীর্ষ জঙ্গি গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে। আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবা ও পার্শ্ববর্তী একটি মুসলিম দেশের (পড়ুন পাকিস্তান) সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই এই খাতে অর্থ ব্যয় করছে। তাদের টাকায় বাংলাদেশে রাতারাতি কওমী মাদ্রাসা বিস্তার লাভ করে।

দুই শীর্ষ জঙ্গি মুফতি ডঃ ওবায়দুল্লাহ্‌ ও

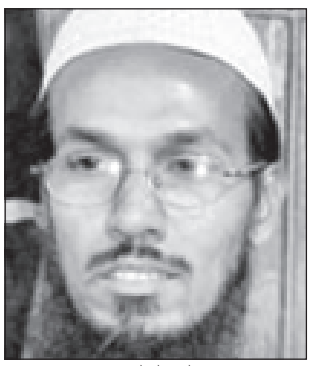

ওবায়াদুল্লা

মুফতি হাবিবুল্লাহ ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পক্ষে। বাংলাদেশের তিনটি পরিচিত ইসলামী দল এদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য তাদের শরণাপন্ন হয়। বাংলাদেশের কিছু ইসলামী দলের নেতারা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তাদের কাছে পরামর্শ চায়। তাদের দাবী দাওয়াতের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম কায়েম সম্ভব নয়। এজন্য সশস্ত্র বিপ্লবের নির্দেশ দেওয়া হয়। সমস্ত ইসলামী দল একটি বিরাট বৈঠক করে। বৈঠকে দুই শীর্ষ জঙ্গি নেতা বাংলাদেশের মুসলমান ভাইদের হত্যা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের কথা তারা এদেশীয় ইসলামী দলের নেতাদের জানিয়ে দেয়। এতে পরিকল্পনা সাময়িক স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে আবারও তারা একত্রিত হয়। মুজাহিদদের বোঝানো হয় এদেশে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। মুসলমানরাই ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পক্ষে প্রধান বাধা। মুসলমান হয়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে এমন মুসলমান একটি মুসলিম দেশে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। যারা এর বিরোধিতা করে তারা ইসলামের শত্রু। এমন বয়ানের পর আবার তারা একত্রিত হতে থাকে। শুরু হয় ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পদক্ষেপ।

দুই শীর্ষ জঙ্গি গোয়েন্দাদের জানায়, হরকত-উল-জিহাদ-এ-ইসলামি সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা হবে। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনা বড় বাধা। সে ইসলামের শত্রু। সে জীবিত থাকলে এদেশে তাগুতি (মানবসৃষ্ট) আইন থাকবে। বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে ইসলামী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে না। ইসলামী আইনও বাস্তবায়ন হবে না। এমন চিন্তা থেকেই হুজি নেতারা শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে তিন বার উদ্যোগ নেয়। ২০০০ সালের ২০ জুলাই শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার সমাবেশস্থলের পাশেই ৫৬ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রাখা হয়। হত্যার ওই মিশন ব্যর্থ হয়। এর দুই দিন পর আবারও শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য গোপালগঞ্জের সমাবেশস্থলের পাশেই ৭৬ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রাখা হয়। সেবারও বেঁচে যান শেখ হাসিনা। সর্বশেষ ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। অল্পের জন্য রক্ষা পান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তীতে ২০০৫ সালের ১ অক্টোবর হরকত-উল-জিহাদ প্রধান মুফতি হান্নান গ্রেফতার হয়। জবানবন্দীতে মুফতি হান্নান জানায়, শেখ হাসিনা ইসলামের শত্রু। সে জীবিত থাকলে বাংলাদেশকে ইসলামী দেশ হিসেবে গঠন করা যাবে না। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, মুফতি হান্নানের দেওয়া স্বীকারোক্তির সঙ্গে দুই জঙ্গির দেওয়া তথ্যের হুবহু মিল রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে দুই জঙ্গি ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ থেকে ২০০৫ সালের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় চালানো মোট ৯০টি বোমা হামলা সম্পর্কে জানে। তাদের পর্যায়ক্রমে এসব হামলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে গোয়েন্দা পুলিশের দক্ষিণ জোনের ডি সি মনিরুল ইসলাম জানান। দুই শীর্ষ জঙ্গি জানায়, মূলত নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো আলাদা হয়ে যায়। আর এই কারণে জে এম বি এবং হুজির মতো সংগঠিত দলগুলো বেকায়দায় রয়েছে বলে দুই শীর্ষ জঙ্গি গোয়েন্দাদের জানায়।

— দৈনিক ইত্তেফাকের সৌজন্যে

আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানী শুরু হচ্ছে

দিদারুল আলম ।। স্বাধীনতার ঘোষক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হত্যা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এই লক্ষ্যে চলতি সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে নিয়োগ কর হচ্ছে চারজন বিচারপতি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর ৩৩ বছর পেরিয়ে গেছে। আরও একটি বছর পার হতে যাচ্ছে। তবুও এই মামলার বিচার কাজ এখনও শেষ হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানসহ পরিবারের নয় সদস্যকে হত্যার অভিযোগে ২৩ জনকে আসামি করে ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ধানমণ্ডি থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ১৫ জন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রায় প্রদান করেন ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ গোলাম রসুল। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন আসামিরা। বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন ও বিচারপতি এবিএম খায়রুল হককে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ দ্বিধাবিভক্ত রায় প্রদান করে। পরে তৃতীয় আদালতের বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ১২ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড ও ৩ জনকে নির্দোষ ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দী পাঁচ আসামি লিভ-টু আপিল দায়ের করেন। তারা হচ্ছেন : অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল (বরখাস্ত) সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারী), একে এম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার) ও মেজর (অব.) বজলুল হুদা।

২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের বিশেষ বেঞ্চ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচ আসামির লিভ-টু-আপিল মঞ্জুর করে। পরে তারা নিয়মিত আপিল দায়ের করেন। যা এখনও বিচারাধীন রয়েছে। নিয়মিত আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়ায় মামলা দায়েরের পর এক যুগ অতিবাহিত হলেও, শেষ হয়নি বহু প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারের কাজ। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতির অভাবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচ আসামির নিয়মিত আপিলের শুনানি সুপ্রিম

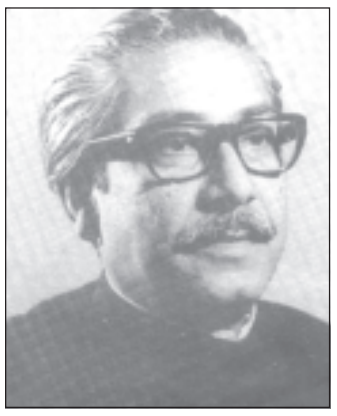

মুজিবর রহমান

শেখ হাসিনা

কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে, এক বছরের অধিককাল। ২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের দায়ের করা লিভ-টু আপিল মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিশেষ বেঞ্চ। এরপর আদালতের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে অর্থাৎ একই বছরের ৩০ অক্টোবরের মধ্যেই তারা সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় নিয়মিত আপিল করেন। ওই সময় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি থাকার পরও সরকার এবং আসামিপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ না করায় আপিল শুনানি শুরু করা সম্ভব হয়নি। এরপর ২০০৮ সালের মে মাসে আপিল বিভাগের বিচারপতি মহঃ হাসান আমীন অবসরে যান। ফলে পুনরায় বেঞ্চ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতির অভাব দেখা দেয়। নিয়ম অনুযায়ী আপিল বিভাগের তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ কোনও মামলার আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী কোনও মামলা হাইকোর্ট বিভাগে শুনানির পর সেই বিচারপতি আপিল বিভাগে নিয়োগ পেলে তিনি আপিল বিভাগে উক্ত মামলা শুনানি করতে পারবেন না। কিন্তু মহাজোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই আপিল বিভাগে দুইজন বিচারপতি নিয়োগ করায় বিচারকের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৭-এ।

বর্তমানে আপিল বিভাগে কর্মরত বিচারপতি এম তাফাজ্জল ইসলাম, বিচারপতি মোঃ জয়নুল আবেদিন, বিচারপতি শাহ আবু নঈম মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি মোঃ আব্দুল আজিজ এই হত্যা মামলার শুনানি গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত। কিন্তু আপিল বিভাগে মামলার জট থাকায় নতুন বিচারপতি নিয়োগ করার পরও নিয়মিত আপিলের শুনানি শুরু করার উদ্যোগ নেয়নি সরকার।

সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ এই হত্যা মামলার বিষয়ে ইত্তেফাককে বলেন, বিচারক নিয়োগ হওয়ার পর সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারাধীন আপিলের দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এটর্নি জেনারেলকে বলা হবে। এছাড়া মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অন্য পলাতক আসামিদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আসামিদের ফিরিয়ে আনতে বর্তমান মহাজোট সরকার সবসময় সচেষ্ট।

ঋসৌজন্যে : দৈনিক ইত্তেফাকৰ

ওড়িশা উপকূল দিয়ে ঢুকছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা ব্যাপকহারে দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রপথ দিয়ে এসে সরাসরি ওড়িশায় ঘাঁটি গাড়ছে। এর ফলে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং শান্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটছে বলে খবর পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৫-এর ২৫ জানুয়ারি ওড়িশার কেন্দ্রপাড়া জেলার মহাকালপাড়া ব্লকে ঢুকে পড়া ১৫৫১ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ সরকারিভাবে দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়নি। সে সময়ে উপকূলে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উপকূল এলাকায় পাঁচটি সামুদ্রিক পুলিশ থানা তৈরির প্রস্তাবও অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু, গত পাঁচবছরে মাত্র তিনটি থানাই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উপকূলে এবং উপকূল সন্নিহিত এলাকায় বিভিন্ন থানাতে মোটর বোট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পূরণ করার কথা থাকলেও এখনও তা হাতে আসেনি। ১৯৫৬-তে ১২৫০ জন ব্যক্তি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে শরণার্থী হিসেবে ওড়িশায় এসেছিল। তাদেরকে রাজনগর নির্বাচনী ক্ষেত্রে শরণার্থী হিসেবে বসবাসের কথা বলা হয়েছিল। তারা সেখানেই বসবাস করছে। তবে সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে লক্ষাধিক।

বাংলাদেশের যশোর, খুলনা, বরিশাল এবং ফরিদপুর জেলা থেকে অনুপ্রবেশকারীরা জলপথে ওড়িশার কেন্দ্রপাড়া, জগৎসিংপুর, বালেশ্বর এবং ভদ্রক জেলায় ঢুকে পড়ছে বলে জানা গিয়েছে। তারা সরকারি খাস জমি ও অন্যের জমিতে

বসতি গড়ে তুলেছে। নিজেদের আসল পরিচয় আড়াল করতে তারা নিজেদের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা থেকে এসেছে বলে পরিচয় দেয়। অনুপ্রবেশ ছাড়াও ওড়িশায় বর্তমানে অন্যতম সমস্যা হল ১০০ ও ৫০০ টাকার জাল নোট। ব্যাপক পরিমাণে যা বাংলাদেশ থেকেই এজেন্ট ও অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে নানা রাস্তা ঘুরে ওড়িশায় পৌঁছে যাচ্ছে। ২০০৪ সালেই ওড়িশার মহাকালপাড়া থেকে এরকম জাল নোট উদ্ধার হয়েছিল। কিছু লোককে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তারও করা হয়। ২০০১-এ একই কারণে রাজনগর এলাকা থেকে কয়েকজন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছিল পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরও এক বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করে ব্যবস্থা নিয়েছিল।

ওই সময়ে বাংলাদেশীরা ওড়িশার বলভদ্রপুর, বরদিয়া, কেউটকেলা, দোসিঙ্গা এবং ধামরা এলাকা থেকে অন্তত ছ'টি বেআইনি রেডিও কেন্দ্র চালাত। ওড়িশার উপকূলবর্তী জেলা জগত-সিংপুরের এরসমা, পারাদ্বীপের আঠারবাঁকী, এবং মুষাড়ি, ভদ্রক জেলার বাসুদেবপুর, ধামরা, দোসিঙ্গা, কেউটকেলা, নরসিংহপুর, বালেশ্বর জেলার সিমুলিয়া, বলরামগড়ি প্রভৃতি স্থানে বাংলাদেশী মুসলমানরা নিজেদের জবরদখল বসতি স্থাপন করে বসবাস করছে। আশঙ্কার কথা হল, এইসব বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে জেলের ছদ্মবেশে মিশে জেহাদী দেশদ্রোহীরা ভারতে ঢুকে পড়ছে।

হরিয়ানাতেও মাওবাদীরা সক্রিয় হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। হরিয়ানাকেও লক্ষ্য বানাচ্ছে মাওবাদীরা। হরিয়ানায় মাওবাদী প্রভাবের খবর কিছুটা অপ্রত্যাশিত হলেও, রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় তাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরাও এই ঘটনাকে হাল্কাভাবে দেখার পক্ষপাতী নন। হরিয়ানায় গ্রামীণ ক্ষেত্র কম হলেও, সম্প্রতি রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় মাওবাদীদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। গত মাসেই রাজ্যের করনাল জেলা থেকে কয়েকজন মাওবাদী সমর্থককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ইন্দ্রী থানার পুলিশ তাদের যমুনানগর থেকে গ্রেপ্তার করে।

এই ঘটনার পরই কিছুটা টনক নড়ে প্রশাসনের। পুলিশ প্রশাসনের অনুমান, করনাল জেলার পাশাপাশি আরও কয়েকটি জেলায় মাওবাদীরা সক্রিয় থাকতে পারে। ইন্দ্রী, বৈশাখ, যমুনানগর প্রভৃতি এলাকায় পুলিশ নজরদারি শুরু করেছে। জেলের বন্দীদের কাছ থেকেও পুলিশ তাদের কাজকর্মের খবর জানতে পেরেছে।

এদিকে গোপন সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, মাওবাদীরা হরিয়ানায় তাদের প্রভাব বৃদ্ধিতে টাকাকে হাতিয়ার করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি তাদের প্রলোভনের শিকার হয়।

প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি প্রতি সদস্য পিছু তারা খরচ করতে চলেছে বলেও বিশেষ সূত্রে জানা গেছে। মাওবাদীরা তাদের সংগঠন বৃদ্ধিতে প্রচারের জন্য গোপনে লিফলেট বিলি করছে। গোপনস্থানে, বিশেষ করে ছোটোখাটো হোটেলে বসেই গেম প্ল্যান তৈরি করছে তারা। পুলিশ প্রশাসন এখনও পর্যন্ত এর কোনও কিনারা করতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের লালগড়-এর ঘটনার পর পুলিশ কিছুটা সক্রিয় হলেও, এখানে তেমন কিছু চোখে পড়েনি। ফলে হরিয়ানার শান্তি-শৃঙ্খলা তথা উন্নয়ণের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট উদ্বেগের।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সমূলে মাওবাদীদের মূল উপড়ে না ফেললে ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরাখন্ড, পশ্চিমবঙ্গের মতো হরিয়ানাও মাওবাদী উপদ্রুত রাজ্যে পরিণত হবে।

সন্ত্রাস দমন আইন নিয়ে কেন্দ্রের বৈষম্য

মহারাষ্ট্রেপাস, গুজরাটে ফেল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কেন্দ্রের দু'মুখো নীতি এখনও বজায় রয়েছে। মকোকা পাস হলেও কেন্দ্রের অসম্মতির ফলে গুজকোকা (গুজরাট.....)-২০০৩ এখনও লটকে আছে। সংগঠিত অপরাধ দমন করতে গুজরাট সরকার মহারাষ্ট্রের ধাঁচে এই আইন তৈরি করতে চায়। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই সরকার থাকার ফলে মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার সেখানে 'মহারাষ্ট্র অর্গানাইজড় ক্রাইম কন্টোল অ্যাক্ট ছত্তখট্রট্রট্রগ্ন আইন বলবৎ করেছে। অথচ একই বিল গুজরাটের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অসহযোগিতায় অনুমোদিত হয়ে রাজ্যে চালু করা যাচ্ছে না।

এই নিয়ে গুজরাটে চতুর্থবার ওই বিল রাজ্য বিধানসভায় পাস হল। কেন্দ্র সরকার বারবার নানা টাল-বাহানা ও সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে বিলটি ফেরৎ পাঠিয়েছে।

এবার গুজরাট বিধানসভা কেন্দ্রের পরামর্শে বিলে 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দ সংযোজন করলেও অন্যান্য সুপারিশ রাজ্য বিধানসভায় অনুমোদিত হয়নি। গত সাত বছর ধরে 'গুজরাট কন্ট্রোল অর্গানাইজড ক্রাইম অর্ডিন্যান্স' ঝুলে রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছে। কেন্দ্র মুম্বাই হামলার পরও এই বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি দিতে দেয়নি। সংগঠিত বিস্ফোরণ ও সন্ত্রাসে যে পাকপন্থী মুসলমান ও সরাসরি পাকিস্তান জড়িত এটা বিভিন্ন ঘটনায় স্পষ্ট। তারপরও কেন্দ্রের গড়িমসি টালবাহানা মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের পাকিস্তান-প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার ঘটনা রীতিমতো লজ্জাজনক। সম্প্রতি এন ডি-এ কেন্দ্র সরকারকে গিলানি, মনমোহন যৌথ বিবৃতি নিয়ে সংসদে তুলোধুনা করেছে। আবার প্রশ্ন উঠেছে, এবারও কেন্দ্র 'গুজকোকা' বিলে সম্মতি দেবে কিনা!

কিছুদিন আগে বিষমদে অনেক সাধারণ মানুষ মারা যাওয়ার গুজরাট সরকার 'নেশা জাতীয় দ্রব্য বিধেয়ক-২০০৯ (সংশোধন) বিল পাস করেছে। এখানে উল্লেখ্য, গুজরাটে মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা আছে। এছাড়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন এবার গুজরাট বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে।

সিকিম-চীন সীমান্তে ট্যাঙ্ক মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। উত্তর সিকিমের ফিঙ্গার উপত্যকায় বাধ্য হয়ে ভারতকে আধুনিক যুদ্ধ ট্যাঙ্ক টি-৭২ মোতায়েন করতে হল। ফিঙ্গার উপত্যকার ওই এলাকার নাম হল সোরা ফানেল। স্থানটির অবস্থান প্রতিরক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্ট্র্যাটেজিক। ভারতের এই সামরিক তৎপরতা ও প্রস্তুতির কারণ হল চীন। চীনের লুব্ধ দৃষ্টি রয়েছে অরুণাচল ও সিকিমেও।

চীন ইতিমধ্যে ভারত সীমান্তের ওপারে মজবুত চওড়া রাস্তা ও যুদ্ধাস্ত্রসহ ব্যাপকহারে সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়েছে বলে জানা গেছে। অথচ ভারতের দিকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সক্রিয়তা কম থাকার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বড় চওড়া ও শক্তপোক্ত রাস্তাই ছিল না। সম্প্রতি বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের (বি আর ও) শৌর্যচক্র পুরস্কারে ভূষিত জালিম সিং-এর দক্ষতায় সিকিমের থেং গ্রাম থেকে ওই মজবুত রাস্তা তৈরি হয়েছে। ওই রাস্তা দিয়ে এক কলমে ট্যাঙ্ক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়েছে। উত্তর সিকিমের ওই পার্বত্য উপত্যকায় ভারি সেনাবাহন যাতায়াত শুরু করেছে। টি-৭২ ট্যাঙ্ক আধুনিক এবং প্রভূত শক্তিশালী।

সূত্রমতে, গতবছর উত্তর সিকিমের ওই ফিঙ্গার উপত্যকায় চীনা সৈন্য বারো বার ভারত সীমান্ত লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়েছিল। এমনকী চীনারা ভারতের এক কিমি ভিতরে সোরা ফানেলেও ঢুকে পড়েছিল। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেই টি-৭২ ট্যাঙ্ক মোতায়েনের জন্য রাস্তা প্রশস্ত এবং সেতুগুলো মজবুত করতে বি আর ও-কে অনুরোধ করা হয়। বি আর ও-এর পক্ষে কাজটা বেশ শক্ত ও চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবুও বি আর ও তা কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছে। চীন তো আগেই তাদের এলাকায় ভারত সীমান্তের ওপরে ভারি অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েন করেছে। চীনের পক্ষে আগে থেকেই যা করার দরকার ছিল না। কেননা, চীন স্বল্প সময়ের মধ্যেই (শর্ট নোটিশে) সেনা ও সাজ-সরঞ্জাম মোতায়েন করতে পারে। রাস্তা-ঘাট বেশ প্রশস্ত ও মজবুত। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, ভারতকে নিকটবর্তী সেনা ঘাঁটিতে সব আগে থেকে মজুত করে রাখতে হয়।

ট্যাঙ্ক ছাড়াও সেনারা ওই এলাকায় প্রতিরক্ষা জোরদার করতে আরও ব্যবস্থা নিয়েছে। তার মধ্যে স্থায়ী সীমা-চৌকি ও বাঙ্কার তৈরি অন্যতম। র‍্যাডার বসেছে ফিঙ্গার উপত্যকায়। পাঠানো হয়েছে সেনার ২৭ নং মাউন্টেন ডিভিশনকে। গতবছর চীন ভারতীয় ভূখন্ডকে জবরদখল করে রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা করেছিল। তখনই বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ওই এলাকা বরাবরই ভারতের এবং সেনারা শুধু এলাকায় টহলদারি করত। চীন বেজিং থেকে পূর্ব-পশ্চিম রাস্তা তৈরি করছে, যা ফিঙ্গার উপত্যকা দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ভারত গতবছর কূটনৈতিকভাবে প্রতিবাদ জানানোর পরই চীন তা বন্ধ করে।

এক দুঃসাহ

পঞ্চাশ বছর আগে

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায়

কথায় বলে সব তীর্থ বারবার, অমরনাথ একবার। হিমালয়ের কোলে এক বিশাল গুহামন্দিরে তুষার শিবলিঙ্গ দর্শনের ইচ্ছা কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ ও পর্যটকদের বহু বছর ধরে টেনেছে। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে এই তীর্থযাত্রা কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তা অভাবনীয়। ৬০-এর দশক ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক কত আলাদা।

৮০-র দশকে জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের আরম্ভ। বছরের পর বছর সেই সন্ত্রাসবাদের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম প্রথম পুলিশ সামরিক বাহিনী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি সন্ত্রাসবাদীদের নাশকতার লক্ষ্য ছিল। অবশ্য পরিকল্পিতভাবে সেই সময় কাশ্মীর উপত্যকায় বসবাসকারী পন্ডিত সম্প্রদায়কে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছিল। ক্রমশ পাকিস্তানের আই এস আই-এর প্ররোচনা, অর্থ ও অস্ত্রের জোর এবং কট্টরপন্থী মনোভাব শুধুমাত্র সাধারণ নরনারী, শিশুদের হত্যা করেই নিরস্ত হয়নি, ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শ্রদ্ধালু মানুষ যখন অমরনাথের পথে চলেছেন তখন তাঁদের উপর আঘাত হেনেছে। তাঁদের রক্তস্রোতে ধার্মিক এবং রাজনৈতিক দাবী আদায়ের প্রয়াস করছে। অতএব পঞ্চাশ বছর পরের অমরনাথ যাত্রা সম্পূর্ণ আলাদা। ৬০-এর দশকে প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল ভীষণ কঠিন। কিন্তু বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রাকৃতিক দুর্গমতা সহজ-সরল করে দিয়েছে। কিন্তু নিয়ে এসেছে সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্রের ঝঙ্কার। ইচ্ছেমতো অমরনাথের পথে বেরিয়ে পড়া আর সম্ভব নয়। অনেক আগে নাম লেখাতে হবে। কবে জম্মু পৌঁছতে হবে, কবে পহেলগাঁও আসতে হবে, অনেক আগেই সেইসব স্থির করা হয়ে যায়। যাত্রা-সূচীর বাইরে কেউই ওই তীর্থক্ষেত্রের দিকে পা বাড়াতে পারবেন না। পহেলগাঁও, চন্দনবাড়ী, শেষনাগ, পঞ্চ তরণী, অমরনাথ-সর্বত্র সুরক্ষাকর্মীদের সমাবেশ। প্রায় ৬০ মাইলের এই পাহাড়ী পথের বাইরের পরিধিতে সুরক্ষার দায়িত্ব সামরিক বাহিনীর। ভিতরের পরিধি কেন্দ্রীয় পুলিশ দলের এবং যাত্রাপথ ও যাত্রীদের সুরক্ষার দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর। শেষনাগ ও পঞ্চ তরণীর রাত্রিবাসের শিবির সুরক্ষার দায়িত্বও পুলিশ বাহিনীর। কিছু দূরে দূরেই চিকিৎসা শিবির। হেলিপ্যাড, চা এবং খাওয়ার দোকান ও পসরা সাজিয়ে বসে রয়েছে দোকানদাররা। সামরিক বাহিনী, কেন্দ্রীয় সুরক্ষা দল ও পুলিশের সঞ্চার ব্যবস্থা সর্বত্র। বর্তমানের স্যাটেলাইট ও মোবাইল ফোনের সহায়তায় যাত্রীরাও প্রতি মুহূর্তে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে প্রাকৃতিক দুর্গমতার জন্য জীবন সংশয় হওয়ার ভয় যদিও অনেক কম, সন্ত্রাসবাদীদের আই ই ডি এবং অস্ত্রের ভয় অনেক বেশি। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বার করার প্রয়াসই নজরে আসে। সমস্ত যাত্রাটাই সুনিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন নদী এবং স্রোতার ওপর অস্থায়ী পুল ও সেগুলির রক্ষণা-বেক্ষণ করা হয়। ফলে প্রাকৃতিক দুর্গমতার কষ্ট অনেকটা লাঘব হলেও, সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের আশঙ্কা যাত্রীদের মনে ভক্তির চাইতে ভয়ের সঞ্চারই বেশি করে।

পঞ্চাশ বছর আগে সন্ত্রাস ছিল না। আততায়ীর গুলি বা আই ই ডি-র ভয়ও ছিল না। ফলে প্রশাসন তেমন ভাবে যাত্রী সুরক্ষার দিকে নজর দিত না। স্থানীয় ঘোড়ার মালিক, পালকির বাহকদল, স্বেচ্ছাসেবী ও ব্যবসায়ীরা বিভিন্নভাবে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য দেখতেন। ১৯৬৫-র যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। যুদ্ধকালীন গোলাগুলি বর্ষণ বন্ধ হলেও পাকিস্তান শান্তিকালীন গোলাগুলিই বর্ষণ করে চলেছে। অর্থাৎ সীমান্ত বাদ দিয়ে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা শান্ত। কিছু কিছু অফিসার দু-মাসের জন্য তাঁদের পরিবারকে শ্রীনগরে নিয়ে আসার অনুমতি পেয়ে গেলেন। তাঁদের অনেকেই স্বামীর নিরাপত্তার জন্য অমরনাথ যাওয়ার মানতও বোধহয় করেছিলেন। জুন মাসের শেষে মূল যাত্রা আরম্ভ হওয়ার আগেই, তাঁরা গুহাতীর্থ অমরনাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়ল দুই ব্যাচেলার অফিসারের ওপর। একজন আমি মেজর গাঙ্গুলী, আর একজন মেজর পীযূষ ভাট। আমাদের ওপর আদেশ হল, সেই যাত্রার আগে একবার অমরনাথ ঘুরে আসতে হবে। সামরিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'রেকি' করে আসতে হবে। অর্থাৎ কোথায় কি প্রয়োজন, কি ধরনের পথ, এই সব বুঝে আসা। মার্চ মাসে আমরা দু-জন "রেকি করতে ঊরি সীমান্ত থেকে পহেলগাঁও পৌঁছে গেলাম এবং এক গুজরাতি হোটেলে আশ্রয় নিলাম। তখন যাত্রার সময় নয়। সরকারি, বেসরকারি কোনও পক্ষই কোনও ব্যবস্থা আরম্ভ করেনি। আমরা পায়ে হেঁটেই যাব। শুধু আমাদের বিছানা, গরম জামা-কাপড়, খাবার ইত্যাদি বহন করার জন্য একটি ঘোড়ার প্রয়োজন। কিন্তু বহু প্রয়াস করেও একটি ঘোড়াও পাওয়া গেল না। সবাই হাসে আর বলে, পাগল নাকি? এখন ৩০-৪০ ফুট বরফের আস্তরণে সমস্ত অঞ্চল ঢেকে রয়েছে। নেই কোনও পথ, আশ্রয় অথবা নদী পার করার পুল। পিশু ঘাঁটির আগে কোনও ঘোড়া যেতে পারবে না। বরফে ডুবে যাবে।

অনেক অনুনয়, বিনয় এবং অর্থের প্রলোভন দেওয়ার পর একটি বছর চৌদ্দ বয়সের কিশোর গোলাম মহম্মদ রাজী হয়। কিন্তু শর্ত একটাই, যত দূর ঘোড়া যাবে, ততদূরই সে যাবে। তাকে জোর করা চলবে না, আমরা রাজী। পহেলগাঁও থেকেই হাঁটা, কারণ চন্দনবাড়ী পর্যন্ত গাড়ির রাস্তা থাকলেও বরফের জন্য গাড়ি যাবে না। রওনা হওয়ার সময় এক কাশ্মীরী মহিলা আমাদের হাতে একটা নারকেল ও কিছু মিষ্টি ধরিয়ে দিল "অমরনাথ যাচ্ছ, বাবার জন্য প্রসাদ নিয়ে যাবে না?" কোমরের ব্যাগে ভরে নিলাম। সামরিক পোশাকে, পিঠে ও কোমরে ব্যাগ ঝুলিয়ে দুজনে রওনা হলাম। হাতে অস্ত্রের জায়গায় লাঠি। চন্দনবাড়ী থেকে পিসুঘাঁটি কয়েক ঘন্টার খাড়া চড়াই, বরফ থাকলেও ঘোড়া সহজেই এগিয়ে চলল। কিন্তু পিসুঘাঁটি থেকে শেষনাগেরপথ প্রায় সমতল, অথচ হাঁটার মতো কোনও পথ নেই। শুধুই বরফের পাহাড়। ঘোড়ার পা বসে যাচ্ছে, পেট বরফে আটকে যাচ্ছে। গোলাম মহম্মদ বলে দিল, 'সাব, ঘোড়া আর যাবে না, দেখছেন না বসে যাচ্ছে।' অনেক মিনতি করে বললাম, শেষনাগ পর্যন্ত অন্তত পৌঁছে দে। ঘোড়ার আগে আগে বরফ ভেঙ্গে কিছুটা পথ করার প্রয়াস করেছিলাম তিনজনে। রাতের অন্ধকারে যখন চতুর্দিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে, আবছা আলো আঁধারিতে সামনে দেখা দিল এক বিশাল ঝিল। গোলাম মহম্মদ বলে দিল 'শেষনাগ লেক,' হিমালয়ের বুকে সেই বিশাল ঝিল এক অপূর্ব দৃশ্য। তার পাশেই পান্থশালা। বরফের চাপে ভেঙ্গে পড়েছে। দরজা, জানালা, দরজার ফ্রেম সবই বরফের চাপে মেঝেতে 'মুখ থুবড়ে' পড়েছে। একটি মাত্র ছোট ঘর কোনও ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোলাম মহম্মদ সেই ঘরেই আমাদের হোল্ডওল দুটি নামিয়ে ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিল। নানা ঘর ঘুরে বেশ কিছু কাঠ যোগাড় করে আনল এবং ঘরের মধ্যেই আগুন জ্বালিয়ে ফেলল। কোনওমতে বেডিং খুলে, আমরা স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। যখন গোলাম মহম্মদ ঘোষণা করল, এর আগে আর ঘোড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, মাথায় বজ্রাঘাত। তাহলে কি করে যাব? অন্তত একটা রাত যাওয়া অথবা ফেরার পথে পঞ্চ তরণীতে কাটাতে হবে?" কোনও উপায় নেই। এখান থেকেই ফিরতে হবে। এর আগে কোনও পথও নেই। সবই বরফে ঢাকা, তোমরাও যেতে পারবে না। এখান থেকে খাড়া চড়াই 'বহুগুণা পাস' প্রায় ১৫০০০ ফিট। তারপর উৎরাই পঞ্চ তরণীতে, তারপর আবার চড়াই পাহাড়ের গা ঘেঁষে অমর-গঙ্গার গায়ে গুহামন্দির পর্যন্ত। অনেক বোঝালাম, তুমি অন্তত চল। পথ প্রদর্শক হিসাবে। কোনও উপায় নেই, ঘোড়া ছেড়ে আমি এক পাও যেতে পারব না। তাহলে কি উপায়? বলল, যেতে আসতে প্রায় ৫০ মাইল পথ একদিনে চলা সম্ভব নয়, বরং ফিরে চল। মাস খানেক বাদে আবার এস, তখন নিয়ে যাব।

পীযূষ ভাটকে বললাম, কি করা যায়? আমার মনে হয় গোলাম মহম্মদ এখানেই থাক। আমরা আমাদের ছোট ঝোলায় কিছু খাবার নিয়ে যদি ভোর চারটেয় বেরিয়ে পড়তে পারি, সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। কিন্তু একটা প্রয়াস না করে ফিরতে চাই না। পীযূষ বলল, আমারও সেই মত। গোলাম মহম্মদকে জানানো হল। সে মুখভার করে বলল, 'সন্ধ্যের মধ্যে ফিরতে পারবে তো? রাত্রে বাইরে থাকলে, জমে কাঠ হয়ে যাবে, আর ফিরতে পারবে না। আমি কিন্তু সেই রাতে অথবা ভোরেই ফিরে যাব।'

রাতে আর ঘুম হলো না। ক্লান্ত শরীর ঘুমুতে চাইছে, কিন্তু ভোরে উঠবার তাগিদ ঘুমতে দিল না। ভোর চারটের ঘন অন্ধকার, ঝিলের জলটাও কালো। কিন্তু আকাশ ভর্তি তারার বাহার। গোলাম মহম্মদ পথ বাতলে দিল। আমরা রওনা হলাম। কোনও পথ নেই, নেই কোনও প্রদর্শক। শুধু একটা দিশা। 'বহুগুণা পাস' চড়তে হবে। তাই উপর দিকেই চলব। সেখান থেকে পঞ্চ তরণী দেখা যাবে। নীচের দিকে কিছুটা চড়াই উঠতেই যে দৃশ্য নজরে পড়ল তা কোনওদিন ভোলার নয়। অন্ততঃ ৩০-৪০টা ঘোড়া বরফের মধ্যে ডুবে রয়েছে। তাদের গলা থেকে মাথা পর্যন্ত বরফের উপর মাথা তুলে রয়েছে। যেন সারি সারি কবরখানার ক্রশ। বোধহয় বিগত বছরে

াহসিক অভিযান

াগে অকালে অমরনাথ

ক কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ)

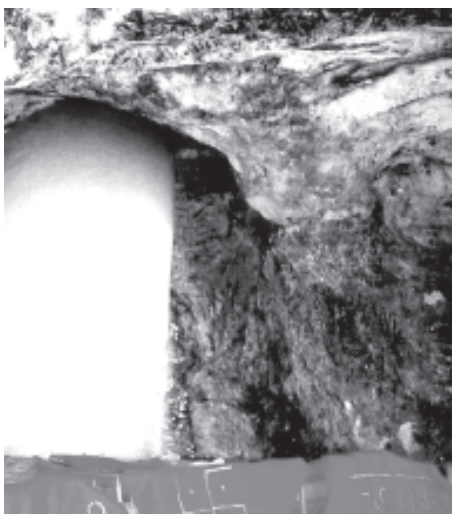

বরফের ধসে তাদের তুষার সমাধি হয়েছে। কিন্তু চোখগুলি যেন জীবন্ত, চকচক করছে। বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। কিন্তু ভাববার সময় নেই, দ্রুত এগিয়ে চললাম। কয়েক ঘন্টার চড়াই-এর পর একটা গলিপথে পৌঁছালাম। দু-পাশে পাহাড়ের চূড়া মাঝখানে কিছুট

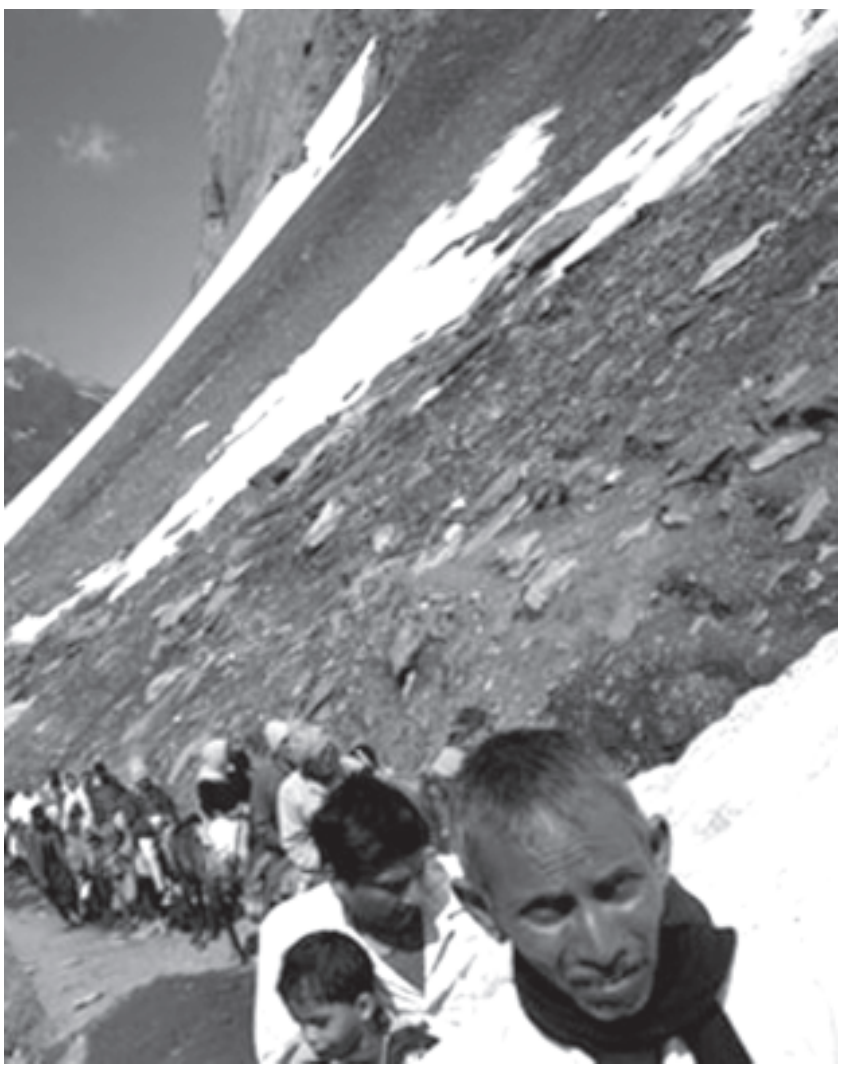

সমতল। বুঝলাম, এটাই বোধহয় বহুগুণা পাস। এখান থেকেই উৎরাই শুরু।

বরফের উপর দিয়ে উৎরাই, ছুটে যাওয়ার সামিল। পিচ্ছিল পথ পা বাড়ালেই ২৫-৩০ মিটার অনায়াস অগ্রসর। বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা দু-জন পঞ্চ তরণীর কাছে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু সামনেই একের পর এক খরস্রোতা নদী। বরফে চলার বুটজুতো খুলে গলায় ঝুলিয়ে, গরম প্যান্ট যতটা সম্ভব গুটিয়ে বাবা অমরনাথের নাম নিয়ে জলে নেমে পড়লাম। হাতের লাঠিটা না থাকলে স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতাম।

যাত্রার সময় এই নদীগুলির উপর অস্থায়ী পুল নির্মাণ করা হয়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দুটি পা-ই অবশ হয়ে গেল, অসাড়। প্যান্ট ভিজে গেল। কোনওমতে নদী পার হলাম। পঞ্চ তরণী পার করে আবার চড়াই, এবার যাত্রার শেষ ভাগ। পাহাড়ের গা বেয়ে পথের ধারণা করা সম্ভব। বর্তমানে বরফে ঢাকা। চলার সময় হাতের লাঠির সহায়তায় সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে হচ্ছে। একবার পা ফস্‌কালে তিনহাজার ফুট নীচে। খরস্রোতা লিডার নদীর ধারা দেখলেই মাথাটা যেন ঘুরে যায়। অমরগঙ্গার তীরে বিশাল গুহা অনেকটা দূর থেকেই দেখা যায়। প্রায় ২৫০ ফুট উঁচু, প্রায় ২০০ ফুট চওড়া গুহার মুখে কোনও মানুষকে পিঁপড়ের মত দেখায়। অমরগঙ্গা তখন বরফে ঢাকা, বরফের তলা দিয়ে জলস্রোত বইছে, কান পাতলে শানা যায়।

শরীরের শেষ শক্তিটুকু খরচ করে, শেষ চড়াই ভেঙ্গে গুহামুখে পৌঁছালাম। দেখলাম, অপূর্ব বিশাল তুষার শিবলিঙ্গ যেন কোনও কারিগর বহু-যত্নে নির্মাণ করেছেন। কাঁচের মতো স্বচ্ছ, চকচকে তার শরীর, মনে হল, যেন এক নীলাভ জ্যোতি ছড়াচ্ছে। ঘড়ি দেখলাম বেলা দুটো। সঙ্গীকে বললাম, পীযূষ মাত্র পনেরো মিনিট সময়, দেরী করলে অন্ধকার হওয়ায় শেষনাগ পৌঁছানো সম্ভব হবে না। আর যদি এই বরফের রাজ্যে পথ হারাই, তাহলে সকালে গোলাম মহম্মদ যেমন বলেছিল 'কাট হয়ে পড়ে থাকব'। কোনওমতে জুতো খুলে, ভেতরে গেলাম। মেঝে দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। এত ঠান্ডা, খালি পায়ে দাঁড়ানো অসম্ভব। পা অবশ হয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে লেফট্ রাইট প্যারেড করতে হচ্ছে। কোনও মতে ব্যাগ থেকে নারকেল ফুল মিষ্টি বার করে শিবলিঙ্গের সামনে লোহার রেলিং তার কাছে নামিয়ে রেখে, প্রণাম করে পিছন ফিরলাম, বাইরে যাব। পীযূষ স্নো-বুট পরে ফেলেছে। মনে হল, কে যেন হাততালি দিল। চমকে উঠলাম, কেউ তো কোথাও নেই। হঠাৎ নজর পড়ল, পাশে একটা ছোট গুহা, তার শেষ প্রান্তে একটা প্রদীপ জ্বলছে। সামনে বসে বছর চল্লিশের এক সাধু। হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভাবলাম তুষারলিঙ্গের সামনে রাখা নারকেল, মিষ্টিগুলি চাইছে। সাধুর গায়ে শুধুমাত্র একটা গেরুয়া চাদর। তার সামনে সেই নারকেল ও মিষ্টি রাখলাম। সাধু সেদিকে না তাকিয়ে ইশারায় হাত বাড়াতে বলল, বুঝলাম সাধু মৌনী। ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। একটা হলুদ সুতো হাতে বেঁধে দিয়ে ইশারায় চলে যেতে বলল। পীযূষ আমার দেরি দেখে আবার গুহায় ঢুকেছে।

বললাম, 'বাবা, একেও আশীর্বাদ কর।" সাধু-ওর হাতেও সুতো বেঁধে দিল। ঘড়িতে আড়াইটে বেজেছে। আমাদের আবার দৌড়ুতে হবে। অন্যথায় অন্ধকারে সমূহ বিপদ। গুহার বাইরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বাইরে দশগজ দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না, ঘন কুয়াশা সব কিছু ঢেকে ফেলেছে।

পঞ্চ তরণী পৌঁছুতে তেমন অসুবিধে না হলেও অনেক বেশি সময় লেগে গেল। আবার জুতো খুলে নদী পার করে চলার সময় রাতের অন্ধকার সবকিছু গ্রাস করল। দু-জনে তখন প্রাণের দায়ে ছুটছি। কোথায়, কোনদিকে যাচ্ছি, তার কোনও ধারণাই নেই। বহুগুণা পাসে পৌঁছুতে হবে, অর্থাৎ চড়াই ধরতে হবে। ভরসা শুধু হাতের লাঠিটা। কিন্তু হঠাৎই পায়ের নীচে থেকে বরফ ধসে গেল। তলা দিয়ে প্রবল বেগে জল যাওয়ার শব্দ। যেন এক মাইন ফিল্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আগে পা ফেলার সাহস হচ্ছে না। পীযূষ ভাট এগিয়ে এল, 'দাদা কেয়া হুয়া, রুক গয়ে?' ইশারায় সামনের গর্ত দেখালাম। গলৎ রাস্তে পর আ গয়ে?" শঙ্কার আভাস স্বরে। দু'জনে মিলে লাঠি দিয়ে মাইন ফিল্ট স্রোব করার মতো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটু শক্ত বরফ, যেখানে পা দিলে ধসে যাবে না খুঁজে বার করলাম। একটু এগিয়ে গিয়ে মনে হল রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে গেছে। একটা বাঁদিকে, অন্যটা ডান দিকে। মাঝখানে নরম বরফ। পা দিলেই ধসে যাবে। কিন্তু কোন দিকে যাব? ভুল দিকে গেলে সারারাত হাঁটলেও বহুগুণা পাস অথবা শেষনাগের দর্শন হবে না। পীযূষ ভাট পকেট থেকে একটা এক টাকার কয়েন বার করে বলল, 'হেড হলে ডান দিক, টেল হলে বাঁ দিক। ও-কে?' আমি বললম ও-কে। টস হল, হেড। অর্থাৎ ডান দিক — বাবা অমরনাথের নাম নিয়ে ডান দিক দিয়ে ছুটলাম। সময় এবং দূরত্বের কোনও হুঁশ রইল না। রইল না কোনও ক্লান্তির চিহ্ন। এই রেস যেন বাঁচার লড়াই। হঠাৎই আবার পা ফস্‌কালো এবং পিচ্ছিল বরফের উপর নীচের কোনও অতলের দিকে উল্কার বেগে ভেসে চললাম। হঠাৎ পতনের বেগ কিছুটা কমল এবং একটা ঘোড়ার মাথা দেখতে পেলাম। প্রাণপণে সেই বরফের থেকে উঠে থাকা ঘোড়ার গলাটা জড়িয়ে ধরলাম। পতন রুদ্ধ হল। যে ভয়টা কিছুক্ষণ আগে মাথায় ভর করেছিল তা হঠাৎই আনন্দে পরিণত হল। মনে পড়ল, যাওয়ার সময় বহু ঘোড়ার বরফ সমাধি দেখেছিলাম। অর্থাৎ আমরা ভুলপথে যাইনি। বরং শেষনাগের কাছেই এসে পড়েছি। কয়েক মুহূর্ত পরে পীযূষ ভাট 'দাদা-দাদা' বলে ডাকতে ডাকতে নেমে এল। বললাম, 'চুপ, বরফের ধস নামাবে নাকি, ও আমার মুখের দিকে তাকাল। ধরে থাকা ঘোড়ার মাথাটা দেখিয়ে বলালম, "চিনতে পারিস?" উল্লসিত হয়ে বলল, "উই আর হোম।"

প্রায় মধ্যরাত্রে শেষনাগের সেই ডেরায় পৌঁছালাম। ঘরের বাইরে একটা ধুনী জ্বালিয়ে গোলাম মহম্মদ বসে রয়েছে। আমাদের দেখে সে ছুটে এল। "আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। আমি ভাবলাম তোমরা মরেই গেছ। আমি আগামীকাল পহেলগাঁও গিয়ে লোকজন নিয়ে খুঁজতে আসার কথা ভাবছিলাম। বাবু, যাত্রী মারা গেলে, গ্রামের লোক আমাকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে। এটাই আমাদের নিয়ম। যাত্রীর সুরক্ষার জন্য আমাদের প্রাণ চলে গেলেও ক্ষতি নেই। যাত্রীই আমাদের রুজি রোটি"। সে কোথা থেকে দুধ নিয়ে এসেছে, হাতে দু-গ্লাস গরম দুধ ধরিয়ে দিল। সারাদিন সম্পূর্ণ অভুক্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত আমরা, দুধটুকু যেন ঘ্রাণ সঞ্চার করল। কোনও খাওয়া দাওয়া নয়, এখন আমরা শুধু ঘুমুবো আর কাল সকালে পহেলগাঁও যাব। স্লিপিং ব্যাগে ঢোকার আগে গোলাম মহম্মদের শেষ প্রশ্ন, "স্যার অমরনাথ পৌঁছুতে পেরেছিলেন?" বললাম নিশ্চয়ই। ফটো দেখাব।'

তারপর আর জ্ঞান নেই। সকালে ঘুম ভেঙ্গে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু গোলাম মহম্মদের ঘোড়ার দর্শন নেই। বরফের রাজত্বে চরতে গিয়েছে। ঘন্টাখানেক পর ঘোড়া এল, আমরা রওনা হলাম। দুপুরের আগেই পহেলগাঁও পৌঁছে গেলাম। প্রথমে অনেকেই বলল, দুঃখিত আপনাদের যাত্রা বিফল হল।' বললাম, 'দুঃখিত কেন হচ্ছেন? অমরা দর্শন করেই এসেছি।' অনেকেই বিশ্বাস করল না। কারণ তৃতীয় দিনেই সকালে অমরনাথ দর্শন করে ফিরে আসা, তাদের ধারণায় অসম্ভব। ফটোর রীলগুলি একটা স্টুডিওতে ডেভলপ করতে পাঠিয়ে আমরা সেই গুজরাতি হোটেলের কামরায় ঘুমিয়ে পড়েছি। সন্ধ্যেবেলা হোটেলের ম্যানেজার ডাকতে এসেছে, "আপনারা নীচে আসুন, পহেলগাঁ-এর বহু ব্যক্তিত্ব আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। আপনারা এবছর এই যাত্রার রেকর্ড করেছেন। ফটো-স্টুডিও এইসব প্রচার করেছে।

মাত্র মাস দেড়েক পর আমাকে আবার ওই পথে যেতে হয়েছিল; প্রায় সাতজন মহিলা তীর্থযাত্রীকে নিয়ে। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। পরের বার বলব। আজ সন্ত্রাসবাদীদের সন্ত্রাস অমরনাথ যাত্রা কলুষিত করছে। পঞ্চাশ বছর আগে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দুর্গমতা বহু মানুষের অদম্য আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা সৃষ্টি করত। এত কষ্ট ও বিপদ পার করে যদি গুহামন্দিরের তুষার শিবলিঙ্গ না দেখা যায়, বিগলিত হয়ে গিয়ে থাকে! তা হলে মনে এক অপূর্ণতা সমস্ত আনন্দ ও তৃপ্তি নষ্ট করে দেয়।

আশা করবো যুগ যুগ ধরে অমরনাথ শ্রদ্ধালু ও পর্যটকদের টানবে। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণেই নয়, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক ও ঐতিহ্যের কারণেও কাশ্মীরীরা তাই-ই চাইবেন। সন্ত্রাসবাদ যাত্রীদের হত্যা করবে না। অর্বাচীন মানুষ তুষারলিঙ্গ সময়ের আগেই বিগলিত করে দেবে না।

চিঠিপত্র

হিলারির ভারত সফর

সম্প্রতি মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিনটন ভারত সফরে এসে যে চুক্তি সম্পাদন করলেন ভারত সরকারের সঙ্গে, তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এই চুক্তি কার্যকর হলে আমেরিকা ভবিষ্যতে ভারতকে যে সব প্রতিরক্ষা সামগ্রী বা যন্ত্রপাতি দেবে তার উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আমেরিকার থাকবে। মার্কিন পর্যবেক্ষক দল ভারত এলে ওইসব যন্ত্রপাতি যেখানে রাখা হবে তা Inspection করতে পারবেন। সেই সুযোগ ভারত সরকারকেই করে দিতে হবে। অপর দিকে সরকারের নিজস্ব যে সব প্রতিরক্ষা যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম মজুত আছে, সেগুলিও আমেরিকার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে যাবে বলে বিজেপি, বামপন্থীরা, এ আই এ ডি এম কে , এমনকী ডি এম কে এবং কংগ্রেসের একাংশ এই চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বিরোধীরা মনে করেন এর ফলে ভারত সরকার আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং ভারতের সার্বভৌমিকতা বিপন্ন হবে।

সবচেয়ে বড় কথা যে বিদেশ থেকে প্রতিরক্ষা যন্ত্রপাতি যদি ভারত সরকার আমদানি করে তাতেও আমেরিকার সম্মতি নিতে হবে। এর ফলে ভারতের নিজস্ব স্বাধীনতা ও সর্বভৌমিকতা আর থাকবে না, পুরোপুরি আমেরিকার তাঁবেদারে পরিণত হবে।

আশিস রায়, বি গার্ডেন, হাওড়া-৩

জঙ্গলের রাজত্ব

লালগড়ে বুদ্ধ দেবের অনুগত যৌথবাহিনী যেভাবে স্কুলের কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের পেটালো অমানুষিকভাবে জানোয়ারের মতো, সেই সম্পর্কে এই চিঠি। অতুটুকু বাচ্চাদের দাবী ছিল তাদের স্কুল ২০ দিন বন্ধ — তা খুলতে হবে। কারণ সেখানে মাওবাদীদের শায়েস্তা করার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পশ্চি মবঙ্গের পুলিশ বাহিনী স্কুল-বাড়ি দখল করে দৈনিক সরকারি অর্থ আনুমানিক ৪৪ লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে। সেই স্কুল খোলার নায্য দাবী নিয়ে বিদ্যালয় ভবনে প্রবেশ করতে গেলে পুলিশকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ যেভাবে লাঠিচার্জ করার নির্দেশ দেয়, তাতে প্রমাণ হয় প্রশাসনের এইসব ব্যক্তিরা মানুষ প্রজাতির পর্যায়ে পড়ে না। কোনও প্ররোচনামূলক বা উস্কানীমূলক ঘটনা বা কথাবার্তা নেই, কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল না স্কুল-ব্যাগে। পড়ার বইপত্র ও স্কুলের পোশাক পরে স্কুলে ক্লাস করার জন্য "স্কুলঘর খালি করে দিতে হবে" — এটাই ছিল তাদের দাবী। তার জন্য তাদের যেভাবে প্রহার করা হল তা দেখলে বা শুনলে পশুও লজ্জা পাবে। প্রশ্ন হল, পুলিশ পুঙ্গব ও তাদের উপরওয়ালারা সকলেই কি অপুত্রক বা আঁটকুড়ো? নাহলে অতটা নির্দয় হয় কী করে। স্কুল পড়ুয়াদের বুঝিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে বা আপোষ করার যাদের কোনও ক্ষমতা নেই তাদের শুধু পুলিশ কেন জল্লাদের চাকরিতেও নেওয়া উচিৎ নয়।

একে তো বত্রিশ বছরে পশ্চি মবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষানীতি তলানিতে এসে ঠেকেছে। এখন আবার ঢং করে সর্বশিক্ষা অভিযান করে কোটি কোটি

টাকার শ্রাদ্ধ করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু থেকে এখনকার কলির বুদ্ধ দেব কোথাও মিটিং করতে গেলে সেখানকার স্কুল-বাড়ি দখল করা হয় পড়াশুনা লাটে তুলে দিয়ে।

এদের মাওবাদী, সমাজবিরোধী শায়েস্তা করার কোনও ক্ষমতা নেই। এরা মহিলাদের পেটায়, ক্যাডারদের দিয়ে ধর্ষণ করায়, সে সময় তাদের কিছু বলে না, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত ছাত্রীদের পেটাতে পটু এরা এবং এই জন্যই মাইনে পায়;আর যত নিরপরাধ ব্যক্তিদের-কাউকে মাওবাদী, কাউকে সন্ত্রাসবাদী সাজিয়ে ধরে নিয়ে যায় পদোন্নতির জন্য।

পৃথিবীর কি কোথাও কেউ শুনেছে ১০/১২ বছরের বাচ্চাদের ন্যায্য দাবীর মিছিল থেকে হটাতে অমানুষের মতো লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ফাটানো? এটা একমাত্র ৩২ বছরের দুর্নীতিযুক্ত পশ্চি মবঙ্গের অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী ও তাদের ক্যাডার এবং প্রভুভক্ত সারমেয় শ্রেণীর প্রশাসকদের দ্বারাই সম্ভব। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় কালাম সাহেব এই সব কর্মের অপদার্থতার জন্য বলেছিলেন 'পশ্চি মবঙ্গ তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্য'। এখন এই সব বাচ্চারা বলছে 'পশ্চি মবঙ্গ জঙ্গলের রাজত্ব'।

দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী।

মেট্রো স্টেশনের নাম

আপনার জনপ্রিয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে মাননীয় রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে একটি আবেদন জানাতে চাই। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের নাম যেমন উত্তমকুমার করা হয়েছে। একই ভাবে দমদম স্টেশনের নাম স্বামী বিবেকানন্দ ও নিউ গড়িয়া স্টেশনের নাম ভগিনী নিবেদিতা সদন করা হোক। সেইসঙ্গে ১৯০৮ সালে প্রথম কালাপানী সাজাপ্রাপ্ত বাঙালী বিপ্লবী বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্রের সাজার (বৃটিশদের দেওয়া শাস্তি) শতবর্ষে আন্দামানের "বিপ্লবীদের রক্তে রাঙা সেলুলার জেল"-এর স্মৃতিকে তুলে ধরতে কিছু করুন।

আধুনিক প্রজন্ম জানুক, কত বীরের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। মুক্তির মন্দির সোপানতলে যারা আত্মবলিদান করেছেন, জীবনের জয়গান গেয়েছেন, সেইসব বীরদের স্মরণ করুক।

প্রণয় রায়, দমদম রোড,
কলকাতা-৩০

প্রকান্ড এক ঝড়

২৫।৫।০৯ দিনটি সোমবার। সেদিন প্রকান্ত ঝড়ে হাসনাবাদের নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে যায়। শুষ্ক মুখে সব মানুষ নদীর ভেড়ীতে বসে থাকে। হাসনাবাদ থেকে ২০ জন স্বয়ংসেবক সেখানে পৌঁছায়। সব বাড়ি থেকে তারা চাল-ডাল সব বের করে আনতে থাকে। ন্যাজাটের ১৮টি বাঁধ ভেঙে গেলে ২০০ জনের মতো দরিদ্র মানুষ খেতে পারলো না।

গত ২৬।৫।০৯ তারিখ মঙ্গলবারে চিঁড়ে, গুড় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। এবার দেখা যাক কী করে সূর্যদেব ওই জল শুষে নেয়।

প্রতীকা বৈদ্য, সপ্তম শ্রেণী, গন্ধর্বপুর, উঃ ২৪ পরগণা।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং বর্তমান প্রজন্ম

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। ঘটনাটি শুনেছিলাম আমার এক শিক্ষক বন্ধুর কাছে। শিক্ষক বন্ধুটি তাঁর স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে শিক্ষক বন্ধুটি ক্লাসের ছাত্রদের প্রশ্ন করেছিলেন "আজ কত তারিখ বলতে পার?" ছাত্ররা সমস্বরে বলে উঠল "আজ ৬ তারিখ স্যার।" শিক্ষক বন্ধুটি তখন ছাত্রদের আবার প্রশ্ন করেছিলেন "আজ এই ৬ জুলাই দিনটি একটি বিশেষ দিন। কেন বলতে পার?" এবার ছাত্ররা সবাই নিরুত্তর, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর কেউ বলল, আজ ষষ্ঠী, কেউ বলল উল্টো রথ, কেউ বলল অম্বুবাচী ইত্যাদি। শিক্ষক বন্ধুটি আবার প্রশ্ন করলেন "আচ্ছা তোমরা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নামটা শুনেছ?" সবাই নিরুত্তর। শেষে এক ছাত্র বলল, হ্যাঁ স্যার আমি নামটা জানি। কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি। আমি কয়েক বার সেখানে গেছি, তবে আর কিছু জানি না।" শিক্ষক বন্ধুটি বললেন "দেখুন অবস্থা, পশ্চি মবঙ্গের স্রষ্টা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নামটা পর্যন্ত বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে না, সত্যিই এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে পশ্চি মবঙ্গের রূপকার বলা হয়। তাঁর নামে কলকাতায় রাস্তা আছে বিধান সরণী। হাসপাতাল আছে। পার্ক আছে। রেল স্টেশন আছে, নগর আছে। অথচ পশ্চি মবঙ্গের স্রষ্টা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আমাদের কাছে অবহেলিত।

জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের অপদার্থতা এবং গদীর লোভের কারণে দেশভাগ যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, পাকিস্তান গঠনের দাবী বানচাল করার আর কোনও উপায় ছিল না;তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তাঁর বিচক্ষণতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন হিন্দুপ্রধান পশ্চি মবঙ্গকে। মুসলিম লীগ নেতা মহঃ আলি জিন্নার দাবী ছিল ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, বালুচিস্তান, উত্তর পশ্চি ম সীমান্ত প্রদেশ, এবং সমগ্র বাংলা নিয়ে পাকিস্তান গঠন করতে হবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা সেটা মেনেও নিয়েছিলেন। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিও পাকিস্তান গঠনের স্বপক্ষে সোচ্চার হয়েছিল। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু তো রামমনোহর লোহিয়াকে তাঁর নোয়াখালি পরিভ্রমণের সময় জল-কাদার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলেও ছিলেন "ঢন্দ্র প্তুপ্সবদন্তন্ধবদত্তত্তড়স্ক্ৰজন্ধবদ প্সন্দ্র ন্ধড়ন্দ্ব স্তুপ্সত্তঙ্ক্জন্তু ভ্রন্দ্ব স্তু ড্রুন্দবন্ধন্দ্ব ন্দ্রজন্দ্বন্দ্বস্তুপ্সপ্প ড্রুন্ধ ড্রুজপ্পকছগুত্তনপুন্ধন্ত প্পন্দ্ব প্সন্দ্র ঢস্তুন্ত্র'দ্ব স্ক্ৰজন্ধনন্ধন্প্স-ডডজ্ঞ. ন্প্সড্রুগ্ন অবশ্য পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে পার্লামেন্টে নেহেরুজী এটা অস্বীকার করেছিলেন। যাই হোক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বাধাদানের ফলে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির একান্ত বাসনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যুক্তি দিয়েছিলেন যদি ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চ ল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়, তাহলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চি মবঙ্গ কেন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। পশ্চি মবাংলাকে অবশ্যই ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ১৯৪১ সালে আদমসুমারীর শুরুতে গান্ধীজী বাংলার হিন্দুদের ওপর এক ফতোয়া জারি করেছিলেন যেন বাংলার হিন্দুরা ওই জনগণনায় অংশ না নেয়। অন্যদিকে

জ ন ম ত

মুসলিম লীগ নেতা মহঃ আলি জিন্নার নির্দেশ ছিল প্রতিটি মুসলমান যেন জনগণনায় অংশ নেয়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বুঝেছিলেন গান্ধীজী বাংলার হিন্দুদের কাছে মৃত্যুবাণ পাঠিয়েছেন। বাংলার হিন্দুরা যদি জনগণনায় অংশ না নেয়, তাহলে হিন্দুরা বাংলায় সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। বাংলা চলে যাবে পাকিস্তানের কবলে। তিনি অন্যদের এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যরা বুঝলেও এবং নিজেদের সর্বনাশ জেনেও কেউই গান্ধীজীর নির্দেশ অমান্য করতে সাহস পায়নি। তাই যা ছিল অবশ্যম্ভাবী তাই হল। জনগণনায় বাংলায় হিন্দুরা হল ৪১.৬ শতাংশ, মুসলমানরা ৫৪.৭ শতাংশ, অন্যান্য ৩.৭ শতাংশ। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও হাল ছেড়ে দেননি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি বাংলার প্রতিটি জেলার প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখালেন পূর্ব-বাংলার জেলাগুলি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, পশ্চি মবাংলার জেলাগুলিতে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং বাংলা ভাগ করতে হবে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চি মবঙ্গ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর তথ্যবহুল অকাট্য যুক্তি মানতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলা ভাগ হয়েছিল, রক্ষা পেয়েছিল পশ্চি মবঙ্গ। যুক্ত হয়েছিল ভারতের সঙ্গে। কংগ্রেসের কিছু সর্বভারতীয় নেতা সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানে ঠেলে দিতে আগ্রহী ছিলেন। সেদিন যদি সমগ্র বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হতো, তা হলে আজ যে সমস্ত পূর্ববঙ্গীয় বামপন্থী নেতা পশ্চি মবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অবদানকে অস্বীকার করছেন, সাম্প্রদায়িক বলছেন, বঙ্গভঙ্গ হিসেবে দোষারোপ করছেন, তাঁদের কি অবস্থা হতো ভাবতেও করুণা হয়!

পশ্চি মবঙ্গকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পশ্চি মবঙ্গের স্রষ্টা। অথচ পশ্চি মবঙ্গের স্রষ্টা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে, তাঁর অবদানকে পশ্চি ম-বঙ্গবাসী বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম জানেই না। যারা জানে তারাও সেটা স্বীকার করে না, বরং বঙ্গভঙ্গকারী হিসেবে দোষারোপ করে। এত বড় কৃতঘ্নতা বাঙালী ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব? সেদিন পশ্চি মবঙ্গ রক্ষা না পেলে, পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে তাঁরা কোথায় যেতেন? কোথায় আশ্রয় পেতেন, কোথায় তাদের সাধের মার্কসবাদ প্রচার করতেন একবার চিন্তা করে দেখুন না! বাঙালী অবিমৃশ্যকারী বলতে বাধা কোথায়?

মথুরায় কৃষ্ণ জন্মস্থানে কেশবদেবের পৌরাণিক বিগ্রহ সত্যিই কি হারিয়ে গেছে?

সোমনাথ নন্দী

মধুপুর — শূরসেন — মথুরা — ইসলামাবাদ। কালাভিঘাতে ভিন্ন চার নাম। কিন্তু ক্ষেত্র এক। বিভিন্ন সময়ে হিন্দুর সপ্তমোক্ষদায়ী ক্ষেত্রের অন্যতম এবং উত্তরপ্রদেশের উল্লেখযোগ্য জেলা শহর মথুরার বিভিন্ন সময়ের পরিচয়। রামায়ণে যাকে জানা যায় মধুপুরী, মহাভারত কালে তাই-ই মথুরা। মুসলমান বিজয়কালে তারই পরিচয় আবার ইসলামাবাদ।

রামায়ণ অনুসারে এই ক্ষেত্রে এক সময় ছিল পরাক্রমী মধু দৈত্যের রাজ্য। রাজ্যের নাম তাঁরই নাম সূত্রে মধুপুরী। মধু দৈত্য ভগবান শঙ্করকে কঠোর তপস্যায় তুষ্ট করে কালসম এক শূল লাভ করেন। যার বলে তিনি ছিলেন অজেয়। পুত্র লবনাসুর পিতৃসূত্রে

ওই শূলের অধিকারী হয়। সে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে থাকে। তার অত্যাচার ক্রূরতা রাজ্যের সীমা পেরিয়ে পৌঁছে যায় ঋষি-মুনিদের তপোবনে। অতিষ্ঠ মুনি ঋষিরা বাধ্য হয়ে ভারতের চক্রবর্তী রাজা অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করেন। ভগবান শ্রীরাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে পাঠান মথুরায়। লবনাসুরকে দমনের জন্য। ঘোর যুদ্ধে লবন পরাস্ত ও নিহত হয়। মধুপুরী হয় অযোধ্যার করদ রাজ্য। যুদ্ধ জয়ে আনন্দিত শ্রীরাম শত্রুঘ্নকে রাজপদে আসীন করেন মধুপুরীতে। মধুপুরীর অদূরে শত্রুঘ্ন নতুন জনপদের পত্তন করেন মথুরার কাটরা গ্রামে। বহুকাল বাদ এই নগরীর অধিকার যায় শূরসেন রাজবংশের হাতে। বলা যায় সেই যাদব জাতির অধিকার শুরু। অন্ধক, বৃষ্ণি ও শূরসেন সম্মিলিতভাবে যাদব নামে পরিচিত হয়। শূরসেন-কুলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। ইতিহাস সূত্র অনুসারে শূরসেনরা ছিলেন শত্রুঘ্নের বংশ পরম্পরা।

মথুরা মহাভারত কালে যাদবদের অধিকারে থাকলেও, অন্ধক বংশীয় উগ্রসেন তনয় কংশ ক্রূরতায় দানব পর্যায়ভুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বধ করার পর মথুরায় কিছুটা শান্তি আসে। কিন্তু কংসের শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধের বাংবার আক্রমণে শ্রীকৃষ্ণ বলরামসহ সমস্ত যাদবদের নিয়ে দ্বারকায় চলে যান। মথুরা যায় মগধের অধিকারে।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর মথুরা আসে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরে অধীনে। দ্বারকায় যাদবকুল ধ্বংস হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র জীবিত কুলপ্রদীপ; তাঁর প্রপৌত্র (প্রদ্যুম্ন তনয় অনিরুদ্ধ পুত্র) বজ্রনাভকে মথুরার সিংহাসনে বসান ও লুপ্তপ্রায় যাদবকুলকে পুনর্বাসন দেন। বজ্রনাভ মথুরাকে দেন নবজীবন। তিনি প্রপিতামহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল প্রকট ও বিগ্রহ প্রকাশে উৎসাহী হন। এতে তাঁকে উৎসাহ যোগান মা উষা ও মহর্ষি শান্ডিল্য। সঙ্গে কুরুরাজ পরীক্ষিৎ অবশ্যই।

ব্রজনাভ ব্রজমন্ডলে চার শিবলিঙ্গ স্থাপন ছাড়া ব্রজবিহারীর অষ্ট বিগ্রহ প্রকট করেন। বিভিন্ন অভিধানুসারে এরা হলেন চারদেব, দুই নাথ এবং দুই গোপাল। চারদেব হলেন মথুরার কেশবদেব, গোবর্ধনের হরিদেব, বৃন্দাবনের গোবিন্দদেব এবং বলদেব। কেশবদেব ছাড়া এখনও তিন বিগ্রহ বিদ্যমান। কেবল হারিয়ে গেছেন কেশবদেব বারংবার ধর্মান্ধ আক্রমণের প্রবল ধাক্কায়।

বরাহপুরাণ অনুসারে মথুরামন্ডল সে সময় ছিল ২০ যোজন (২৪০ কিমি) পরিমিত স্থান জুড়ে। পরবর্তীকালে মথুরা বৌদ্ধ ও জৈনদেরও উপাসনাস্থল ও সারস্বত চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সে ধারা অব্যাহত ছিল খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত। অষ্টম শতাব্দীতে ইসলামের নিশান নিয়ে আরবদের ভারত অভিযান শুরু হলে ভারতবাসী পরিচিত হয়ে ওঠে 'জিহাদ' কথাটির সঙ্গে। এই একবিংশ শতাব্দীতে তার বীভৎসতা আরও বেশিমাত্রায় প্রকট। মুসলিম বিজয় অভিযানের নিশান ছিল রাজনৈতিক ইসলামের কেতন। যার উদগাতা ছিলেন তুরস্কের খলিফারা। খলিফারাই তখন মুসলিম জাহানের সর্বোচ্চ ধর্মনেতা। তাঁদের খুশী করে এসেছেন মুসলিম দুনিয়ার সুলতান মামুদ থেকে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গ জেব পর্যন্ত সকলে। তাদের হাতের তরবারি ঝলসে উঠেছিল বিধর্মী কাফের হত্যায়। তাদের সমস্ত দেবস্থান, সারস্বত চর্চা কেন্দ্র ধূলোয় মিশিয়ে দিতে। বাদ যায়নি মথুরা ও কৃষ্ণ জন্মস্থানের সুবিশাল, অপরূপ চারুকলা সমৃদ্ধ দু-দুটো মন্দির। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ কেশবদেব নামে যে বিগ্রহ প্রকট করেছিলেন ও তাঁর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন কালের ছোবলে তা বিনষ্ট হলে খৃস্টীয় প্রথম শতকে অর্থাৎ কুষাণ যুগে সাড়াশ নামে এক রাজা কেশবদেবের নতুন মন্দির তৈরি করেন। যার সম্মুখভাগে ছিল সুদৃশ্য তোরণ। সংলগ্ন বিশাল বাগান।

খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে গুপ্ত বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সেই মন্দির স্থলে গড়ে তোলেন সুদৃশ্য আর একটি মন্দির। চীনা পরিব্রাজক যুয়ান চোয়াঙ (হিউয়েন সাঙ) ৬৩০ খৃস্টাব্দে মো-তিউ-লো-তে (মথুরা) মন্দির দর্শন করে তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী সি-ইউ-ফি-তে লেখেন সে কথা।

১০১৮ খৃস্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদের সঙ্গী এক ঐতিহাসিক সে মন্দির দর্শন করে বলেছিলেন — "যদি কেউ এর মতো সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করতে ইচ্ছুক হন, তাকে সহস্র সহস্র সুবর্ণ দিরহাম ব্যয় করতে হবে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিদের দু'শ বছর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করালেও এরকম সৌধ নির্মাণে সমর্থ হবে কিনা সন্দেহ।"

সুলতান মামুদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মন্দিরের ধন-সম্পত্তি ও সোনা রূপার বিগ্রহ কেবল নয়, ছিল জিহাদের মনোভাব। সেবারের অভিযান ছিল একাদশতম। মথুরা তখন বুলন্দশহর নৃপতি হরদত্তের শাসনে। কাপুরুষ হরদত্ত মামুদকে প্রসন্ন করতে ৩০টি হাতি উপহার দেন ও পরিবারসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মহাবনের (গোকুল) রাজা কুলচাঁদ ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। পরাজিত কুলচাঁদ রানীসহ আত্মঘাতী হলেন।

লুণ্ঠন চালালেন মামুদ একনাগাড়ে ২০ দিন মথুরা ও মহাবনে। গুঁড়িয়ে দিলেন কেশবদেবের অপূর্ব নয়ননন্দন মন্দির। হত্যা করলেন ব্রজবাসীদের নৃশংসভাবে। মামুদ মথুরা লুণ্ঠনে যে ধনরাশি পেয়েছিলেন তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন মামুদের মীরমুন্সি (সচিব) ও সমকালীন ঐতিহাসিক অল উটবি তাঁর ফরিস্তায় (স্মৃতিকথা) — "বায়ান বা মথুরা থেকে মামুদ পান ১০ কোটি দিরহাম। বহু স্বর্ণমুদ্রা। তার মধ্যে পাঁচ বিগ্রহই ছিল ৫ মন সোনার।" এরপর থেকে মথুরা হয়ে যায় নিঝুম প্রেতপুরী। সুদীর্ঘ সময়।

১১৫০ সালে মথুরা নরেশ বিজয়পালদেব ১০৪ ফুট ৬৫৩ ফুট দৈর্ঘ প্রস্থের চতুর্থ দেবালয় গড়ে তোলেন কাটরা

স্থানে। কিন্তু তা সহ্য হল না ধর্মান্ধ সুলতান। সিকন্দর লোদীর (১৪৮৮-১৫০৩)। ধ্বংস করে দিলেন কেশবদেবসহ মথুরায় গড়ে ওঠা সব মন্দির। ঐতিহাসিক এইচ এম এলিয়ট তাঁর "হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া"র চতুর্থ খন্ডে বিবরণ দিয়েছেন এই ভীষণ ধ্বংসলীলার। ১৫১৬ সালে কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্যদেব মথুরায় এসে বনাকীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেখতে পান প্রাচীন উন্নত জনপদ মথুরাকে। "মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান / জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম" (চৈ. চ মধ্য/১৭/২৯৩)। অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব দর্শন করেছিলেন কেশবদেবকে। যা অক্ষতভাবে রক্ষিত ছিল সেবায়েতদের ছোট মন্দিরে।

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে (১৬০৫-১৬২৭) ওরছা অধিপতি বীরসিং বুন্দেলা তৈরি করেন কেশবদেবের পঞ্চ ম ও শেষ মন্দির। ফরাসী পর্যটক তাভারনিয়েঁ সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে (১৬২৮-৫৮) ভারত পরিভ্রমণ কালে কেশবদেবের মন্দিরটি দেখে মোহিত হয়ে যান। তিনিও বজ্রনাভ নির্মিত কালো পাথরের মূর্তিটি দেখেছিলেন। মন্দিরটিকে ছিল অর্ধ শতাব্দী। সহ্য হল না ধর্মান্ধ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের। ১৬৬৯ সালের এপ্রিল মাসে এক ফরমান জারি করে হুকুম দিলেন মথুরা বৃন্দাবনের সব মন্দির ভেঙে ফেলার। 'মসির-ই-আলমগিরিরি' রচয়িতা মুস্তান খাঁ লিখেছেন — "অল্প সময়ের মধ্যে বাদশার মনসবদার ও ফৌজদাররা প্রচুর মেহনত করে ভেঙে দিল কাফেরদের বিরাট কেন্দ্র মথুরার মন্দির। রত্নখচিত মূর্তিগুলি আগ্রায় নিয়ে গিয়ে বেগম সাহেবার (জাহানারা) মুসেল্লামের সিঁড়ির নীচে পুঁতে দেওয়া হল। মথুরার নাম বদল করে রাখা হল ইসলামাবাদ।" মুঘলবাহিনী মন্দির ধ্বংস করলেও, বিগ্রহের ক্ষতি করতে পারেনি। আগেই মেবারের রানা রাজসিংহ সরিয়ে নিয়ে যান বিগ্রহ। জন্মস্থানের মন্দির স্থলে গড়ে ওঠে বিশাল লালপাথরের মসজিদ।

১৮০৩ সালে মথুরা বৃটিশ অধিকারে এলে, কাটরা কেশবদেবের পরিত্যক্ত ভূমি দখল নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ১৮১৫ সালে তা নীলামে বিক্রি করা হয় কাশীনরেশ পটনিমলকে। ইচ্ছা সত্ত্বেও পটনিমলের সম্ভব হয়নি নতুন মন্দির নির্মাণের।

১৯৪৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পন্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধে বিশিষ্ট শিল্পপতি যুগলকিশোর বিড়লা কিনে নেন কাটরা কেশবদের ভূখন্ড। ১৯৫১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি "কৃষ্ণ জন্মস্থান ট্রাস্ট" নামে একটি অছি পরিষদ গঠন করে বিড়লাজী তুলে দেন ভূখণ্ড তাদের হাতে। সেখানে কেশবদেবের নতুন বিগ্রহ সমেত মন্দির তৈরি করেন জয়দয়াল ডালমিয়া, ১৯৫৮-র ৬ সেপ্টেম্বর। কিন্তু কেশবদেবের মূল বিগ্রহের সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। একথা ঠিক আওরঙ্গজেবের আক্রমণ হবে জেনে মেবার ও জয়পুরের রাজারা বৃন্দাবন -মথুরার সব পৌরাণিক বিগ্রহ রাজপুতানায় নিয়ে যান ও সেখানে মন্দির স্থাপন করে রাখেন তাঁদের। কেশবদেবের তেমন কোনও মন্দিরের সন্ধান আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। সঠিক তথ্যও অনুপস্থিত।

প্রকৃত সন্ন্যাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মহারাষ্ট্রের সন্ত সন্তোয়া পওয়ার একদা এক গ্রামে এসে পৌঁছান। ছোট গ্রামে মাত্র কয়েক ঘরেরই বাস। সন্তোয়া ভিক্ষা করতে করতে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে পৌঁছালেন। ‘ভিক্ষা দিন মা’ বলে হাঁক দিতেই ব্রাহ্মণী বাইরে বেরিয়ে এলেন। সন্তোয়াকে ভিক্ষা দিতে দিতে ব্রাহ্মণী বললেন, “মহারাজ, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি গুরুতর সমস্যায় পড়েছি। আমাকে রক্ষা করুন। ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দিন।

মহারাজ অবাক হলেন। ব্রাহ্মণীকে আশ্বস্ত করে বললেন, চিন্তা করো না মা। তোমার কী অসুবিধা, আমায় বলো। ভগবান নিশ্চয় কোনও না কোনও পথ বের করে দেবেন”।

ব্রাহ্মণী চোখের জল মুছতে মুছতে খুলে বললেন সব অসুবিধার কথা। বললেন, “প্রতিদিনই আমার স্বামী ঝগড়া করে। কোনও উত্তর দিলেই সন্ন্যাসী হবার ভয় দেখায়। কারণে-অকারণে ঝগড়া আমার আর সহ্য হচ্ছে না। নিত্যদিনের এই সমস্যা থেকে আমায় বাঁচান। স্বামীকে কিছু বললেই ঘর ছেড়ে চলে যাবার ভয়ও দেখায়। বলে কে দেখবে তোমায়।”

মহারাজ সব কথা শুনলেন। সবকিছু আত্মস্থ করে বললেন, “মা, তুমি নিজেই এর সমাধান করতে পারবে। কাল থেকে স্বামীর কথায় ভয় পেয়ো না। সন্ন্যাসী হবার ভয় দেখালেই বলবে, চলে যাও। আমার চিন্তা আমি নিজেই করবো। তোমাকে ভাবতে হবে না।”

স্বামীজীর কথায় স্বস্তি পেলেন ব্রাহ্মণী। পরের দিন সকাল বেলায় এক ব্রাহ্মণ সন্তোয়া পওয়ারের কাছে হাজির। অচেনা ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণের হাব-ভাব দেখে মহারাজ বুঝতে

বোধ কথা

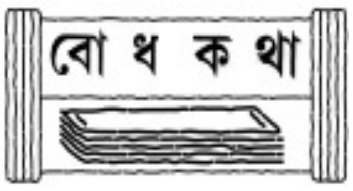

পারলেন, এই ব্রাহ্মণ সেই ঘরেরই। ব্রাহ্মণকে কাছে ডেকে বললেন, “কি হয়েছে তোমার। কি কারণে এসেছ এখানে”। ব্রাহ্মণ সন্তোয়ার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, “মহারাজ আমায় সন্ন্যাস মন্ত্র দিন। সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্তি দিন। আমি সংসারের মধ্যে থাকতে চাই না। আপনার সঙ্গী করুন”।

মহারাজ হাসতে হাসতে উত্তরে বললেন, “দেখ। এই কাজ বড় শক্ত। তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না”। ব্রাহ্মণ নাছোড়বান্দা। উপায় নেই দেখে মহারাজ শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। বললেন, “ঠিক আছে। তুমি আজ থেকেই সন্ন্যাসী হলে। যাও কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা চেয়ে আনো”। এই বলে একটা থালা ধরিয়ে ভিক্ষায় পাঠালেন তাঁকে।

ব্রাহ্মণ গ্রামের অনেক ঘর ঘুরলেন। কিন্তু বেশিরভাগ ঘরই তার মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিল। গুটি কয়েক ঘর থেকে অল্প কিছু চাল সংগ্রহ করে ফিরে এলেন। মহারাজ ব্রাহ্মণকে তাঁর ও তাঁর নিজের সংগ্রহ করা চাল রান্না করতে বললেন। যথা সময়ে ব্রাহ্মণ তাও করলেন। খেতে বসলেন দু’জনে।

মহারাজ অনায়াসে সব ভাত খেতে পারলেও, ব্রাহ্মণ দু’গ্রাস মুখে দিয়েই উঠে পড়লেন। মহারাজ মনে মনে হাসলেন। ব্রাহ্মণকে বসিয়ে বললেন, “এই খাবার তোমাকে রোজই খেতে হবে”। এই কথা শুনে তিনি আরও রেগে গেলেন। উত্তরে বললেন, এই খাবার আমার ধাতে সইবে না। এর থেকে আমার ঝঞ্ঝাটে সংসার জীবনই ভালো। মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, “দেখ, সন্ন্যাস নেব বলে শুধু আমোদে জীবন কাটালেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। দেহের ভিতর-বাহির সবই সন্ন্যাস হওয়া চাই। না হলে প্রকৃত সন্ন্যাস হবে কীভাবে। হাব-ভাব, চাল-চলন সবই সন্ন্যাসের মতো না হলে, সন্ন্যাস হবার স্বপ্ন দেখো না। সংসার জীবনেই ফিরে যাও তুমি”। ব্রাহ্মণও বুঝলেন, সন্ন্যাসী হওয়ার স্বপ্ন দেখা যতটা সহজ, সন্ন্যাসী হওয়া অতটা নয়। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের এক গ্রামের।

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

আদিতে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ ‘এভারেস্ট’ কে আদম ও ইভের নামে ‘Everest’ বলা হত। ১৮০০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ সার্ভে অব ইন্ডিয়া এর নাম দেয় ‘পিক্ ফিফটিন’(xv)। সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইন্ডিয়া কর্ণেল অ্যান্ড্রু ওয়াঘ তাঁর পূর্বসুরী কর্ণেল এভারেস্ট- এর নামানুসারে এই উচ্চতম শৃঙ্গটির নামকরণ করেন ‘মাউন্ট এভারেস্ট’।

❖ ❖ ❖

শুধু যে পাখিরাই পাথর খায়, তা নয়। তিমি ওয়ালরাস সীল প্রজাতির জলজ প্রাণীরাও পাথর খেকো। কিছু কিছু সীল মাছের পাকস্থলী থেকে এগারো কেজির মতো পাথর পাওয়া গিয়েছে। অনেক সময় এরা সমুদ্রের তলদেশ থেকে বিভিন্ন আকারের এবং বর্ণের পাথর গিলে এনে উপকূলে জমা করে। এরা পাথর খায় শুধু খাদ্যবস্তু চূর্ণ করার জন্য নয়, এদের দেহে যখন অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বি জমে, তখন দেহ মন থেকে তুলনামূলকভাবে হাল্কা হয়ে যায়। তাই পাথর খেয়ে নিজেদের দেহের ওজন বাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করে। তাছাড়া পাথরের সঙ্গে ঘর্ষণে ওদের পেটে যেসব পরজীবী প্রাণী আছে সেগুলোও মারা পড়ে।

❖ ❖ ❖

‘বিষ্ণুপ্রিয়া’ নামে একটি ভাষা আছে, যা মণিপুরী ভাষারই এক আঞ্চলিক রূপ। একদল দাবী করলেন, ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’-কে স্বীকৃতি দিতে হবে। বহু ভাষাই এভাবে আন্দোলনের বিষয় হয়েছে; প্রাসঙ্গিক হয়েছে অন্যান্য দাবীও। ভাষা, জাতিসত্তা এবং সাংস্কৃতিক অস্মিতার দাবীতে আন্দোলন পৃথিবীর নানা দেশে নব নবরূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

❖ ❖ ❖

বই নয়, জুতোই ছিল বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনের সখ। বইয়ের থেকেও বেশি খরচ করতেন সৌখিন জুতোর পিছনে। তথ্যটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা আর্থিক তথ্যাদি সম্বলিত একটি বই থেকে। ক্রাইস্ট কলেজে পড়ার সময় ডারউইন ১৯ শতকের ধনীদের মতো বিলাসবহুল জীবন- যাপন করতেন। দারোয়ান, পিতলের কারিগর, টুপি নির্মাতা, ধোপা, নাপিত, দর্জি, বাড়ি রংকারী, শু-শাইন বয়, ইত্যাকার প্রত্যেকের জন্যই আলাদা খরচ করতেন ডারউইন।

❖ ❖ ❖

দেশে-বিদেশে বিখ্যাত মানুষদের প্রতি সম্মান জানাতে অনেক সময় তাঁদের নামে কোনও একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়। কিন্তু যখন কোনও কাল্পনিক চরিত্রের নামে রাস্তার নাম রাখা হয় তখন একটু অবাকই লাগে। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত বিগত যুগের প্রখ্যাত লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকাশিত স্বর্ণলতা সেই সময় সর্বস্তরের পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। তাই তখনকার বিদ্বজ্জন সমাজ চরিত্রটিকে স্মরণীয় করে রাখতে কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে ‘স্বর্ণলতা’র নামে একটি রাস্তার নামকরণের আর্জি জানান। ১৯৩৭ সালে কর্পোরেশন দক্ষিণ কলকাতার একটি রাস্তার নামকরণ করে ‘স্বর্ণলতা স্ট্রীট’ নামে।

❖ ❖ ❖

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন সাংঘাতিক দন্তরোগী। শেষে সব দাঁত ফেলে নকল দাঁত বসিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দাঁতগুলো হিপোপটেমাস আর গরুর দাঁত কেটে স্প্রিং দিয়ে জুড়ে বানানো হয়েছিল।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

মা : অঙ্কে কত পেয়েছিস রে?

ছেলে : মাত্র একের জন্য একশো পাইনি মা।

মা : নিরানব্বই পেয়েছিস বুঝি!

ছেলে : না, দুটো শূন্য পেয়েছি।

☺ ☺ ☺

মধুবাবু : জুতোর দোকানের চাকরিটা ছাড়লেন কেন?

যদুবাবু : কী করব, ফিট করল না যে!

☺ ☺ ☺

বুঝলেন, আমার সারা পৃথিবী ঘোরা। লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক রোম করাচি, সব!

আপনি তাহলে জিওগ্রাফিটা ভালই জানেন।

সে আর বলতে! চারদিন ছিলাম তো আমি জিওগ্রাফিতে!

☺ ☺ ☺

শিক্ষক : বল তো, কোন মাসে আঠাশ দিন?

ছাত্র ঃ সব ক’টা মাসেই স্যার।

☺ ☺ ☺

প্রশ্ন : জীবনসঙ্গিনী মানে কি?

উত্তর : জীবনকে যে সঙ্গিন করে তোলে।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। মাইকেল জ্যাকসনরা মিলে যে-ব্যান্ড তৈরি করেছিলেন তার নাম কী?

২। জগন্নাথদেবের মাসির নাম কী?

৩। ইংল্যান্ডের কোন্ রাজা ইংরেজি জানতেন না?

৪। ‘অজ্ঞতা লজ্জার নয়, জ্ঞানলাভের অনিচ্ছাই লজ্জার’। কে একথা বলেছিলেন?

৫। বাংলায় প্রথম কল্প-বিজ্ঞানের বই লিখেছেন কে?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। জ্যাকসন ফাইভ

২। অর্ধাসনী দেবী

৩। রাজা প্রথম জর্জ

৪। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

৫। হেমেন্দ্রকুমার রায়

(‘মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন’)

পরলোকে ওঙ্কার ভাবে

পিতৃতুল্য অভিভাবকের স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত কার্যকর্তারা

সংবাদদাতা ।। গত ২৩ জুলাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি ওঙ্কার ভাবে পরিষদের দিল্লীর রামকৃষ্ণপুরমস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সকালে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। শ্বাসকষ্ট হওয়াতে তাঁকে গত ২৭ জুন দিল্লীর রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় তাঁর ডানদিকের ফুসফুস ৭০ ভাগই ব্লক হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। তাঁকে চিকিৎসকরা কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র দিয়ে ইন্টেনসিভ কেয়ার-এ নিয়ে যান। ২১ জুলাই তাঁর রক্তে ইউরিয়া বাড়তে থাকে। শরীর আর চিকিৎসাই নিতে পারছিল না। তখন ২৩ জুলাই সকালে তাঁকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পৌঁছানোর ১৫ মিনিট পরেই শরীর শান্ত হয়ে যায়। পরে বিকেল পাঁচটায় দিল্লীর নিগমবোধ ঘাটে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ ভাবে মুখাগ্নি করেন।

মৃত্যুসংবাদ পেয়েই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ। সকলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁদের মধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উপদেষ্টা গিরিরাজ কিশোর, সভাপতি অশোক সিংহল, কার্যকরী সভাপতি এস বেদান্তম্, সঙ্ঘের নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন, প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী, বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিংহ, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি, বেঙ্কাইয়া নাইডু, অধ্যাপক বাল আপ্তে, অনন্তকুমার, কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক রামলালজী, সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক মধুভাই কুলকার্ণী, বিদ্যাভারতীর সংগঠন সম্পাদক ব্রহ্মদেব শর্মা, সূরজকৃষ্ণজী, সাধবী ঋতাম্ভরা এবং বিনয় কাটিয়ার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন সঙ্ঘের বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, মদনদাসজী (অঃ ভাঃ প্রচারক প্রমুখ), আন্নাসাহেব মুরকুরে, প্রভাকরণ কেলকর, দীনেশ কুলকার্ণী এবং ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক বজরংলাল গুপ্তা প্রমুখ। সরসঙ্ঘচালক শ্রীভাগবত বলেছেন — সর্বজনপ্রিয় ওঙ্কার ভাবের প্রয়াণ দেশব্যাপী হাজার হাজার কার্যকর্তাদের কাছে পিতৃতুল্য অভিভাবকের স্নেহছায়া থেকে বঞ্চি ত হওয়ার সমান। অত্যন্ত দুঃখজনক, যদিও তিনি প্রায় মাসখানেক যাবৎ অচেতনাবস্থায় থাকায় সকলেই সন্দেহ করছিলেন এরকম একটা কিছু হবে। তবুও তাঁর সান্নিধ্য থেকে মুক্ত হওয়াটা কারোরই মনে সায় দেয় না। তাঁর দৃঢ়তা, শুচিতা, শালীনতা, প্রসন্নতা এবং আচরণ মনের স্মৃতিতে সাজিয়ে রাখাটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব। তিনি তাঁর তপস্যাপূত কর্মজীবনের কারণে পরলোকে অবশ্যই দিব্য সদ্‌গতি লাভ করবেন।

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন বলেন, '১৯৪১ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত জববলপুরে পড়াশোনা করার সময়ই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তখন আমি জববলপুরের গোলবাজার শাখার মুখ্যশিক্ষক। ওঙ্কার ভাবেজী তাঁর ছোট ভাই-এর কাছে ওখানে মাঝে মাঝে আসতেন। এলে আমার শাখায় পুরো সময় থাকতেন। সেই সময়ে উনি উত্তরপ্রদেশে বিভাগ প্রচারক ছিলেন।

১৯৬৯-এ আমি মধ্যভারতের প্রান্ত প্রচারক এবং অখিল ভারতীয় শারীরিক প্রমুখ হই। তখন ভাবেজীও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের শারীরিক প্রমুখ হন। ফলে তাঁর সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হতোই। শারীরিক

ওঙ্কার ভাবে - ২৬.৭.১৯২৪ - ২৩.৭.২০০৯

বিভাগে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত করার চিন্তাভাবনা হয়। শারীরিক বিষয়সূচীতে দন্ডযুদ্ধ ও নিযুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়। পর্যালোচনায় ভাবেজীর অংশগ্রহণ ও মতামত গুরুত্বপূর্ণ ও লাভদায়ক ছিল। তাঁর জীবন সঙ্ঘকার্য এবং হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সমর্পিত ছিল। উনি অন্যদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস হিসেবেই কাজ করতে থাকেন। তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।'

প্রয়াত ভাবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি অশোক সিংহল বলেন, : ১৯৪৩-৪৪-এ ওঙ্কার ভাবেজী এবং আমি একই শাখার স্বয়ংসেবক ছিলাম। স্বর্গগত সরসঙ্ঘচালক রজ্জু ভাইয়াও ওই শাখাতে যেতেন। ১৯৮২ সালে উনি এবং আমি একসঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা হই। উনি উত্তরপ্রদেশে কর্মরত ছিলেন। ওখানে যে বিরাট বড় আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলনে তাঁর যোগদান বেশ বড় আকারেই ছিল। রাম জন্মভূমি আন্দোলনের প্রথম সমিতি — শ্রীরাম জন্মভূমি মুক্তিযজ্ঞ সমিতির তিনি সম্পাদক হন। তখন থেকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে ওই কাজে লেগে যান। ভাবেজী চিন্তাভাবনার দিক থেকে পরিপক্ক ছিলেন, অনেক বিষয়েই অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সরলতা। উনি উপস্থিত থাকলে গম্ভীর পরিবেশও হাল্কা হাস্যমুখর হয়ে যেত। ভাবেজীর লেখালেখি করার বিশেষ রুচি ছিল। তাঁর এতই অভিজ্ঞতা ছিল যে, আমরা সব ব্যাপারেই তাঁর পরামর্শ নিতে পারতাম। তাঁর প্রয়াণে সংগঠনের প্রভূত ক্ষতি হল।

স্বর্গীয় ওঙ্কার ভাবের জন্ম ১৯২৪ সালের ২৬ জুলাই শ্রাবণ কৃষ্ণা দশমী তিথিতে উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। নাগপুরেই তিনি ১৯৪০, ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে সঙ্ঘের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ-এর প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৪৫ সালে প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর সঙ্ঘের প্রচারক হন। ১৯৪৫-এ প্রয়াগে প্রথমে নগর ও পরে জেলা প্রচারক হন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত উনি লক্ষ্ণৌ বিভাগ প্রচারক এবং রাষ্ট্রধর্ম পুস্তক প্রকাশনের ব্যবস্থাপক ছিলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত 'রাষ্ট্রধর্ম' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন।

এক সময় সারা দেশে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের মুখ্যশিক্ষক কেবলমাত্র নাগপুর থেকে আসতেন। ১৯৬২ সালে পশ্চিম উত্তর প্রদেশের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে তিনি মুখ্যশিক্ষক ছিলেন। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময়েও তিনি উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮২ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংস্কৃতি রক্ষা যোজনায় তিনি উত্তরপ্রদেশের প্রমুখ নিযুক্ত হন। ১৯৮৪ সালে শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন শুরু হলে তিনি শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তিযজ্ঞ সমিতি এবং ধর্মস্থান মুক্তিযজ্ঞ সমিতির বরিষ্ঠ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৮৪ থেকেই এই আন্দোলনে তিনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯১-এ তাঁর কেন্দ্র লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক হন। ১৯৯৫-এ ভাবেজী পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ২০০৯-এ সহ-সভাপতি হন। এই সময়ে তিনি মাতৃশক্তি এবং দুর্গাবাহিনীর কাজে দেশব্যাপী মার্গদর্শন করেন। প্রকাশনে তাঁর সবিশেষ রুচি ছিল। তিনি পাক্ষিক 'হিন্দু বিশ্ব' পত্রিকার প্রকাশক এবং সম্পাদকও ছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন রাষ্ট্র এবং সংগঠনের কাজেই সমর্পিত ছিল।

ভাবমূর্তি রাখতে আরবী ভাষায় চ্যানেল খুলল চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সম্প্রতি সাম্যবাদী কম্যুনিস্ট শাসিত লাল চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে হান চীনা এবং উইগুর মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে গেছে। এই ঘটনায় আরব দুনিয়ায় নিজেদের ভাবমূর্তি বিপন্ন হতে পারে বুঝে চীন নানা ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হয়েছে। চীনের শাসকরা চীনের ঘটনা আরব দুনিয়ায় মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দিতে আরবী ভাষায় এক সরকারি টি ভি চ্যানেল ইতিমধ্যেই খুলে ফেলেছে। এই চ্যানেলের সম্প্রচারের দায়িত্বে রয়েছে সরকারি সংস্থা — 'চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশন'। এই দূরদর্শন পরিষেবা ২২টি আরব দেশের ৩০ কোটি দর্শকের কাছে পৌঁছাবে।

চীনের আশা, ওই চ্যানেলে যে সব খবর, মনোরঞ্জকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখানো হবে তার ফলে মধ্য পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের মধ্যে চীনের সঠিক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হবে। চীন দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক প্রচার মাধ্যমকে দায়ী করে আসছে যে, তারা চীনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে না।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে চীনের কাছে আরবের তেল ভান্ডার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকদিন থেকেই তাই চীন 'আরবী চ্যানেল' খোলার পরিকল্পনা ছকে রেখেছিল। সম্প্রতি চীনের সঙ্গে আরব দেশগুলোর বাণিজ্য ভালোরকম বেড়েছে। ৯/১১-র (আমেরিকা) পরবর্তী অধ্যায়ে আরব দেশগুলোও চীনে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। ২০০৪-এ 'চীন-আরব সহযোগিতা মঞ্চ' স্থাপিত হয়েছে। ২০০৪ থেকে ২০০৮-র মধ্যে চীন এবং আরব দেশগুলির মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য হয়েছে। এই সাফল্যের পর চীন আরব দেশগুলোর সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্য নীতি প্রণয়নের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে বলে জানা গেছে।

ওইসব দেশের মধ্যে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরিন এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহী। চীনের কোম্পানীগুলো এখন আরব দেশের বিভিন্ন ছোট-বড় কাজের বরাত পাচ্ছে। চলতি দশকে চীন অন্ততঃপক্ষে এরকম ৩০০০টি 'মউ' স্বাক্ষর করেছে। উইগুর-হান চীনা দাঙ্গার ফলে লোকসান যাতে না হয় সেজন্যই আগ বাড়িয়ে চীন আরবী চ্যানেল খুলেছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। মুসলিম জগতের বেনিয়ারা চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্বন্ধ যাতে বিচ্ছেদ না করে সেটাও অন্যতম কারণ।

চীনের সাম্যবাদী সরকার জিনজিয়াং প্রদেশের মুসলমানদের ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ই মুছে দিতে চাইছে। অবশ্য পাকিস্তান সহ কোনও মুসলিম বন্ধুভাবাপন্ন দেশ চীনের বিরুদ্ধে সমালোচনা বা মন্তব্য করেনি। এমনকী ভারতের সংখ্যালঘু দরদী ও চীনপন্থী সিপিএম-এর নেতারাও 'রা' কাড়েনি হান চীনা বনাম উইগুর মুসলমান দাঙ্গা বিষয়ে। যে সব ইসলামী দেশ কাশ্মীর প্রসঙ্গে বারবার ভারতকে দায়ী করে থাকে, তারাও দূরেই থেকেছে। চীন চাইছিল জিনজিয়াং প্রদেশে চীন সরকারের দমন-পীড়ন এক আমেরিকান চক্রান্ত বলে বিশ্বজুড়ে প্রচারিত হোক। সাম্যবাদী চীনপন্থী ভারত ও অন্যদেশের কমিউনিস্টরা তাই করেছে। আরব দেশগুলো জিনজিয়াং-এর দাঙ্গা নিয়ে চুপচাপ অথবা চীনের সরকারকেই সমর্থন জানিয়েছে। তারাও চায় না চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে কোনওরকম ফাটল ধরুক। একমাত্র ব্যতিক্রম হ ল তুরস্ক। তুর্কীরা তীব্র সমালোচনা করেছে চীনের। তুর্কীদের সঙ্গে উইগুরদের অনেক সামঞ্জস্য থাকাই এর কারণ।

রঙ্গম

শিশু সাহিত্য উৎসব শিশু বিকাশের সহায়ক

।। দীপেন ভাদুড়ী।।

শিশু কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য অনলস চেষ্টা করে চলেছে বেশ কিছু শিশু-কিশোর পত্রিকা এবং কবি সাহিত্যিকগণ।

এক সময় "শিশুসাথী" "মৌচাক" "ষষ্ঠি মধু" "শুকতারা" "সন্দেশ" শিশু মনের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করত। কালের গর্ভে "শুকতারা" এবং "সন্দেশ" ব্যতীত এখন আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধরনের শিশু-কিশোর পত্রিকা প্রকাশের বিরাম নেই। এক সময় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন "ছোটদের পাততাড়ি"-র পরিচালক স্বপন বুড়ো ওরফে অখিল নিয়োগী এবং "আনন্দ মেলা"র পরিচালক মৌমাছি ওরফে বিমল ঘোষ। বহুদিন তাঁরা শিশু কিশোরদের উন্নতিকল্পে অনলস চেষ্টা করেছেন।

তারও আগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুখলতা রাও, লীলা মজুমদার, উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় প্রমুখেরা শিশু কিশোর সাহিত্যকে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিশু কিশোর সাহিত্যের সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের অথবা কাজী নজরুল ইসলামের নাম সসম্মানে উচ্চারিত হয় শিশু কিশোর সাহিত্যে।

বর্তমানে "আনন্দ মেলা" "আলোর ফুলকি" "কিশোর দুনিয়া" "অজগর" "সোনার খনি" "নতুন প্রভাত" ইত্যাদি পত্রিকা শিশু-কিশোরদের উন্নতিকল্পে প্রকাশিত হয়ে চলেছে এবং জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে।

গত ২১ জুন '০৯ রবিবার সারাদিন ব্যাপী "নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন" হাওড়া শাখার অনুষ্ঠান হয়ে গেল, হাওড়া জেলার সাউথ সাঁকরাইল হাইস্কুলে। উপস্থিত ছিলেন নজরুল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি জিয়াদ আলি। নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের রাজ্য সম্পাদক আনসার উল হক।

হাওড়া জেলা শাখার সভাপতি ড. অনির্বাণ রায়চৌধুরী বললেন, আমাদের অনলস প্রচেষ্টা করতে হবে, শিশু কিশোরদের চরিত্র গঠনে সহায়ক কিশোর -সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। তাদের আগ্রহ বাড়াতে হবে। কারণ তারাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক এবং তাদের ভিতর থেকেই উঠে আসবে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার।

"আলোর ফুলকি" পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক আনসার উল হক বললেন, শিশু কিশোরদের অভিভাবকবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশু কিশোরদের উৎসাহিত করতে হবে শিশু-কিশোর সাহিত্য অনুশীলনে। স্কুলের পড়া ও শারীরিক শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য পাঠেও উৎসাহিত করতে হবে।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যা(অনির্বাণ রায়চৌধুরী।

শিশু সাহিত্যকে ভালোবেসে বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন শতাধিক শিশু-কিশোর সাহিত্যিক কবি। তাঁদের উৎসাহ দেখে এই প্রতিবেদকের মনে হল এই ধরনের সমাবেশ, সাহিত্য আসর, কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান যত বেশি হয় তত উন্নত হবে শিশু কিশোর সাহিত্য।

কয়েকজন কবির সঙ্গে আলোচনায় উঠে এলো এ ধরনের অনুষ্ঠান টিভির জনপ্রিয়তা কমাতে সাহায্য করবে। যেহেতু টিভির বেশিরভাগ অনুষ্ঠান শিশু কিশোর অনুপযোগী।

প্রতিবেদক জানতে চেয়েছিলেন এখানে আপনারা বেশির ভাগ কবি প্রবীণ, অথচ আপনারা শিশু কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য, কবিতা, ছড়া রচনা করছেন, কিন্তু তাদের মনের চাহিদার কথা কি আপনারা জানতে পারছেন? তাদের উপস্থিতি কোথায়?

সম্পাদক রবীন চট্টোপাধ্যায় জানালেন, এখানে আমরা সকলে অভিভাবক। আমরা সন্তানদের সঙ্গে আলোচনা করি, তাদের আগ্রহের বিষয়বস্তু জানার চেষ্টা করি এবং তার প্রতিফলন হয় আমাদের রচনায়। শিশু কিশোরদের নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ করে থাকি।

শব্দরূপ - ৫১৮

মেঘকন্যা দেবশর্মা

■	■	■	১	■	২		৩
■	৪			■		■	
৫	■	■	৬			■	
৭				■	■	■	
	■	■	■	৮			
	■	৯			■	■	
	■		■	১০			■
১১			■		■	■	■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. আরবি শব্দে কেরানি, উর্দু শিক্ষক, ৪. সিদ্ধি দাতা, গজানন, লম্বোদর, ৬. নুন, ৭. বিশেষণে অন্ধকার পূর্ণ, শেষ দুয়ে দানব, ৮. রাজাধিরাজ, সম্রাট, বাদশাহ, মধ্যে ইঙ্গ মুরগি, ৯. ডাক নামে সত্যজিৎ রায়, ১০. "উঠ গো — লক্ষ্মী, উঠ আদি জগত-জন পূজ্যা" , ১১. ঢেউ।।

উপর-নীচ ঃ ১. নতুন পাতাযুক্ত শাখা, বৃক্ষাদির কচি পাতা, ২. একই শব্দে চোখ বোজা, ছাপার কাজ, সিলমোহরের কাজ, ৩. ব্রাহ্মধর্মের একজন কর্ণধার, প্রথম দুয়ে মহাদেব, তিনে-চারে প্রভু, ৫. বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থের নাম, প্রথম তিনে কল্যাণ, ৮. উপকরণহীন খাদ্য, অত্যন্ত দরিদ্রোপযোগী খাদ্য, ৯. ইঙ্গ শব্দে খুন, নরহত্যা।

সমাধান শব্দরূপ ৫১৬

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
সত্যেন মন্ডল
নলহাটী, বীরভূম।

■	■	ক	র্ণা	ট	ক	■	ত্রি
তু	ব	ড়ি	■	■	রা	■	প
■	হু	■	ই	■	ত	ব	ল
■	র	বী	ন্দ্র	■	■	স	■
■	ক	■	■	অ	ন	ন্ত	■
রা	ম	দা	■	জ্ঞ	■	রা	■
য়	■	ত	■	■	বা	য়	না
ট	■	ব্য	ব	চ্ছে	দ	■	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ আগস্ট ২০০৯ সংখ্যায়।
শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

জনগণের টাকায় চলছে নেহরু-গান্ধী পরিবারের নাম খোদাই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। টাকা ঢালছেন দেশের জনগণ আর সেই টাকায় নেহেরু-গান্ধী পরিবারের তিন প্রতিনিধি জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর নামে একের পর এক প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ইতিপূর্বে আমরা স্বস্তিকা'য় দেখিয়েছি, মায়াবতী কীভাবে নিজের ও তাঁর গুরু কাঁসিরামের একের পর এক মূর্তি গড়ে চলেছেন সরকারি টাকায়। এ নিয়ে যতটা হইচই হয়েছে, তার কিয়দংশও কিন্তু হয়নি নেহেরু-গান্ধী পরিবারের নাম খোদাই নিয়ে। আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, সারা দেশে প্রচুর প্রকল্প রয়েছে এবং বেশ কিছু পরিকল্পনা আগামীদিনে গৃহীত হচ্ছে, যেগুলি ইউপিএ সরকার নেহেরু-গান্ধী পরিবারের নামে উৎসর্গ করেছে বা আগামীদিনে করতে চলেছে। এই প্রকল্পগুলি বিস্তৃত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে, বন্দর এবং বিমানবন্দর, জাতীয় পার্ক ও অভয়ারণ্য, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ট্রফি এবং স্টেডিয়াম, হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ প্রোগ্রামে, আনন্দ -অনুষ্ঠানে, রাস্তা ও নির্মাণক্ষেত্র সহ সর্বত্র। সব মিলিয়ে এখনও অবধি সরকারি টাকায় প্রায় পাঁচশরও বেশি প্রকল্প চলছে হয় জওহরলাল নেহেরু, নয়তো ইন্দিরা গান্ধী বা রাজীব গান্ধীর নামে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব ১১টি প্রকল্প নেহেরু-গান্ধী পরিবারের ওই তিন ব্যক্তির নামে রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রায় ৫২টি প্রকল্প রয়েছে তাঁদের নামে। ক্রীড়াক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট বা ট্রফির বিচারে ২৮টি উৎসর্গীকৃত হয়েছে নেহেরু-ইন্দিরা-রাজীবের নামে। তাঁদের নামে নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামের সংখ্যাও নেহাত মন্দ নয়, ১৯টি। ৫টি বিমান বন্দর বা বন্দর নামাঙ্কিত হয়েছে তাঁদের নামে। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আমরা সকলেই জানি। দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (জে এন ইউ) তো জগৎবিখ্যাত। এগুলি বাদ দিলেও আরও

দশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নামাঙ্কিত হয়েছে রাজীব গান্ধীর নামে। কংগ্রেস ও এন সি পি সরকার পরিচালিত মহারাষ্ট্রে ৯৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলির নামকরণ করা হয়েছে নেহেরু-গান্ধী পরিবারের ওই তিন সদস্যের নামে। এছাড়াও, ১৭টি জাতীয় বা রাজ্যস্তরের পুরস্কারের নামও ওই তিনব্যক্তির নামে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের নামে মিলবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের গোটা ন'য়েক স্কলারশিপও। জাতীয় পার্ক, অভয়ারণ্য ও মিউজিয়াম-এর সংখ্যাটা এগারো। বলা বাহুল্য, যেগুলি তাঁদের নামে পরিচিত সেই হিসেবটাই এখানে দাখিল করা হল। আনন্দ-উৎসবের ক্ষেত্রে রাজীব গান্ধীর নাম দেওয়া উৎসবের সংখ্যাটা সাত। এছাড়াও আরও ৩৭টা ছোটো-খাটো উৎসব রয়েছে নেহেরু-ইন্দিরা-রাজীবের নামে। দশটি বড় বড় স্থান বা রাস্তা কিংবা নির্মাণের নাম দেওয়া হয়েছে তাঁদের নামে। এছাড়াও শুধু দিল্লীতেই ছোটখাটো ৭৪টি স্থান রয়েছে ওঁদের নামে। সবই যখন হল, তখন আর চিকিৎসাক্ষেত্রটাই বা বাদ যায় কেন। ১০টি প্রসিদ্ধ হাসপাতালের নাম রয়েছে নেহেরু-গান্ধী পরিবারের এই তিন ব্যক্তির নামে। সেই সঙ্গে বাণিজ্য নগরী মুম্বাইতে প্রায় ৩৯টি স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের নাম তাঁদের নামাঙ্কিত।

প্রত্যেকটি প্রকল্পের পেছনে টাকা ঢালছে হয় কেন্দ্রীয় সরকার, নয়তো রাজ্য সরকার। সেই টাকা আমার-আপনার টাকা, জনগণের টাকা। এই প্রভূত অর্থ কোনও একটি বিশেষ পরিবারকে তুষ্ট করার জন্য কাজে লাগালে তার কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার জনগণের বিলক্ষণ রয়েছে। এই কৈফিয়ত দিতে বাধ্য কেন্দ্রীয় সরকার বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। ভারতবর্ষ রাজতান্ত্রিক নয়, একটা গণতান্ত্রিক দেশ। দেশের স্বাধীনতা বা পুনর্গঠনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশী তাদেরকে ভুলে, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারগুলি একটা বিশেষ স্বার্থে ওই 'বিশেষ পরিবার'টির স্মৃতি ফলক লাগাতে উদ্যত হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, নেহেরু-গান্ধী পরিবারের নামাঙ্কিত অধিকাংশ প্রকল্পেরই চেয়ারপারসন-এর পদটি দখল করে রেখেছেন সনিয়া গান্ধী।

একনজরে

নেহেরু-গান্ধী পরিবারের তিন সদস্যের নামে কিছু প্রকল্প

কেন্দ্রীয়স্তর (প্রকল্প-১১টি)

(১) রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ যোজনা।
(২) ইন্দিরা আবাস যোজনা।
(৩) জওহরলাল নেহেরু আরবান রিনিউয়াল মিশন।

রাজ্যস্তর (প্রকল্প - ৫২টি)

(১) রাজীব গান্ধী প্রাথমিক শিক্ষা মিশন, রায়গড়।
(২) রাজীব গান্ধী ফুড সিকিউরিটি মিশন ফর ট্রাইবাল এরিয়াজ, মধ্যপ্রদেশ।
(৩) ইন্দিরা গান্ধী ল্যান্ডলেস এগ্রিকালচার লেবার স্কিম, মহারাষ্ট্র সরকার।

ক্রীড়াক্ষেত্র

(ক) টুর্নামেন্ট (প্রকল্প ২৮টি)
(১) রাজীব গান্ধী গোল্ডকাপ কাবাডি টুর্নামেন্ট।
(২) ইন্দিরা গান্ধী বোট রেস।
(৩) জওহরলাল নেহেরু হকি টুর্নামেন্ট।
(খ) স্টেডিয়াম (প্রকল্প-১৯টি)
(১) ইন্দিরা গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্স, দিল্লী।
(২) জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়াম, নয়াদিল্লী।

বিমানবন্দর / বন্দর (প্রকল্প - ৫টি)

(১) রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, নয়া হায়দরাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ।
(২) জওহরলাল নেহেরু নব সেবা পোর্ট ট্রাস্ট, মুম্বাই।

বিশ্ববিদ্যালয় / অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রকল্প-১০৮টি)

(১) রাজীব গান্ধী ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট।

পুরস্কার (প্রকল্প ৬৮টি)

(১) ইন্দিরা গান্ধী প্রাইজ ফর ন্যাশানাল ইন্টিগ্রেশন।
(২) রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কার।

স্কলারশিপ / ফেলোশিপ (অন্তত ৯টি)

(১) রাজীব গান্ধী ফেলোশিপ, ইগনু

জাতীয় পার্ক / অভয়ারণ্য / মিউজিয়াম (প্রকল্প অন্তত ১১টি)

(১) রাজীব গান্ধী ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি, অন্ধ্রপ্রদেশ
(২) ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশানাল পার্ক, তামিলনাড়ু।

হাসপাতাল (প্রকল্প - ৫১টি)

(১) রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি অব্ হেলথ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

রাস্তা (প্রকল্প অন্তত ৮৪টি)

(১) নেহেরু প্লেস, নয়া দিল্লী।
(২) রাজীব চক, দিল্লী।
(৩) ইন্দিরা চক, নয়াদিল্লী।

মঙ্গলনিধি

কনিষ্ঠ পুত্র প্রসেনজিৎ সিংহ-র বিবাহ উপলক্ষ্যে মঙ্গলনিধি প্রদান করলেন সঙ্ঘের কলকাতা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা কল্যাণ আশ্রমের প্রাক্তন পূর্ণকালীন কার্যকর্তা মুক্তিশঙ্কর সিংহ। গত ৫ জুলাই কলকাতা সিথি কোরাস বিয়ে বাড়িতে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তিনি মঙ্গলনিধি তুলে দেন সঙ্ঘের ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদারের হাতে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী, প্রাক্তন ক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ বংশীলাল সোনী, কলকাতা মহানগর কার্যবাহ সুশীল রায় সহ বিশিষ্ট কার্যকর্তারা।

অনুপ্রবেশ বিরোধী মঞ্চ

বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী ভারতবর্ষে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়ছে এবং ভারতবর্ষের জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এই অনুপ্রবেশকারীদের অত্যাচারে পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময় এসেছে। উল্লেখ্য ৮০-র দশকে অসমে রাজনৈতিক দলগুলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সংখ্যালঘু ভোটের জন্য তাদের ভারত বিরোধী কার্যকলাপকে দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এমত পরিস্থিতিতে বাংলার বুকে এসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে হটাবার জন্য তীব্র আন্দোলনের ডাক দিয়ে জনমত তৈরি করতে রাস্তায় নামতে চলেছে অনুপ্রবেশ বিরোধী মঞ্চ ।

শোক সংবাদ

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক ও প্রাক্তন প্রচারক আশুতোষ বর্মনের মাতৃদেবী গত ২৫ জুলাই ৬৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

Swastika
10 August - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

ভারত বিরোধিতায় আবার সক্রিয় রাশিয়া

পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে মায়ানমার

নিউক্লিয়ার সার্কিট – আগামী দিনে এমন দৃশ্য দেখার জন্যই কি প্রস্তুত মায়ানমার?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ইরান, উত্তর কোরিয়ার পর এবার মায়ানমার। জন্ম হতে চলেছে আরও এক পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের। স্বাধীনতাপূর্তির তেষট্টি বছরের প্রাক্কালে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ঈশান কোণে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। অকস্মাৎ জেগে উঠেছে বহুদিনের ঘুমন্ত দৈত্য রাশিয়া। ইদানীং কালে আমেরিকা, চীন ও এদের সাঙ্গোপাঙ্গদের দাপটে রাশিয়ার ভারত-বিরোধিতাটা অনেকটা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল। মায়নামার (বর্মা)-কে পরমাণু অস্ত্র তৈরীতে মদত যুগিয়ে ভারত বিরোধিতার ক্ষেত্রে আবার পুরনো জায়গাটা ফিরে পেতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে রাশিয়া। বিশ্বের ক্ষমতাশালী দেশগুলির ক্যানভাস থেকে আচমকা উধাও হয়ে যাওয়া রাশিয়া আবার তার পুরনো রঙ ফিরে পেল বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

গত ১ আগস্ট সিডনি মর্নিং হেরাল্ড পত্রিকায় একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়। দুই মায়ানমারীয় অকালকুষ্মান্ডকে উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি জানায়, উত্তর কোরিয়া এবং রাশিয়ার সহযোগিতায় মায়ানমার জুন্টা (ওদেশের সৈন্যবাহিনী) গোপনে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর এবং প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশন পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই দুটি বস্তুর সাহায্যেই ২০১৪ সালের মধ্যে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হবার যাবতীয় পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে মায়ানমারের শাসকগোষ্ঠী। সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী, পরমাণু বোমা তৈরীর গোপন ডেরাটি রয়েছে উত্তর বর্মার নাংলিয়াং পাহাড়ের একটি গুহায়। ওই পাহাড়টিতে একইসঙ্গে রাশিয়ার পক্ষ থেকে একটি অসামরিক পারমাণবিক চুল্লী স্থাপন করা হয়েছে। যেটা নিয়ে রাশিয়া এবং মায়ানমার উভয়েরই বক্তব্য, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বলয়ের কথা মাথায় রেখেই তারা এটা করেছে। যে দুই মায়ানমারীয় এই গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন মোয়ে জো সানডে হেরাল্ডের প্রতিনিধি ডেসমন্ড বলকে বলেছে,

উত্তর কোরিয়ার জাহাজ এগিয়ে চলেছে বর্মা উপকূলের দিকে।

''মায়ানমার সেনাবাহিনীর এক অফিসার তাঁর নিতান্ত গোপনীয় নিউক্লিয়ার সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে ইতিমধ্যেই রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে গিয়ে দু'বছর ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন।'' অপরজন তিন মিনের বক্তব্য, ''বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর এক প্রাক্তন কর্মকর্তা তেই জো যিনি ছটো (শেয়ার মার্কেট) বাণিজ্যের মালিক, সেই তিনিই নিউক্লিয়ার আদান-প্রদান নিয়ে রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করতেন।'' প্রসঙ্গত, মোয়ে জো প্রাক্তন সেনা অফিসার এবং তিন মিন তেই জো'র ছটো ট্রেডিং-এ কর্মরত ছিল।

পুরো বিষয়টাকে কেন্দ্র করে ব্যাঙ্কক পোস্ট স্পেকট্রাম ম্যাগাজিন আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিয়েছে। তারা বলছে, মায়ানমারের প্রায় দশটা জায়গায় ইউরেনিয়াম খনি রয়েছে এবং দুটি প্ল্যান্ট গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে ইউরেনিয়াম পরিশুদ্ধ (রিফাইন) করে তা হলুদ কেক (ইয়েলো কেক)-এ পরিণত করা হচ্ছে। নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র তৈরীতে এই হলুদ কেক ফিসাইল মেটিরিয়াল বা সহজে বিদারণীয় বস্তু হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ যা সহজে ফেটে গিয়ে নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণে সহায়তা করবে। এর সঙ্গে সেখানে, রাশিয়ার সম্পূর্ণ কারিগরি সহযোগিতায় প্লুটোনিয়াম পুনঃপ্রক্রিয়া (রিপ্রসেসিং)-র কাজ জোরকদমে চলছে। প্রসঙ্গত, মায়ানমার ২০০৭ সালের মে মাস নাগাদ

সজ্জিত পরমাণু অস্ত্র সম্ভার।

রাশিয়ার সঙ্গে এক সমঝোতা চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করে। সেই চুক্তি পত্রে বলা হয়, রাশিয়ার সহযোগিতায় ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে ১০ মেগাওয়াট লাইট ওয়াটার পারমাণবিক প্রকল্প গড়ে তোলা হবে মায়ানমারে।

সিডনি মর্নিং হেরাল্ড পত্রিকার সেই সাংবাদিক ডেসমন্ড বল তিন মিনকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'তাঁরা বলছেন হাসপাতালে স্বাস্থ্যের কারণে পারমাণবিক কর্মসূচীর মাধ্যমে মেডিক্যাল আইসোটোপ উৎপন্ন হওয়া একান্ত জরুরী।' তিন মিনও বলেছেন, 'বর্মায় কতগুলি হাসপাতালে নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান গ্রহণের সুবিধে রয়েছে?' পুরো বিষয়টা প্রকাশ্যে আসার পর মায়ানমারের কূটনৈতিক মহল থেকে আওয়াজ তোলা হচ্ছিল, সম্পূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচীটাই নাকি অসামরিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যে যুক্তিকে তাঁর কলামে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন ডেসমন্ড।

২০০২ সাল নাগাদ মায়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে আই এ ই এ-কে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তারা অসামরিক নিউক্লিয়ার কর্মসূচীতে যোগদান করতে ইচ্ছুক। পরবর্তী পর্যায়ে রাশিয়া ঘোষণা করে তারা মায়ানমারে অসামরিক পারমাণবিক চুল্লী গড়ে তুলবে। এই প্রেক্ষিতে জানা গেছে, আল কায়দার পক্ষ থেকে দু'জন পাকিস্তানী বিজ্ঞানীকে মায়ানমারে পাঠানো হয়েছিল, তাদের প্রস্তাবিত প্রকল্পে সহায়তা করার জন্য। তবে সাম্প্রতিক কালে ডেভিড অলব্রাইটের নেতৃত্বাধীন আই এস আই এসের পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক করা হচ্ছিল যে উত্তর কোরিয়ার সাহায্য নিয়ে মায়ানমার নিউক্লিয়ার প্রকল্প গড়ে তুলছে।

রাশিয়ার এই অকস্মাৎ 'পিক্চারে' চলে আসায় উদ্বিগ্ন আমেরিকা। রাশিয়াকে তারা সরাসরি কিছু বলতে পারছে না। তবে গত মাসে থাইল্যান্ডে এ এস ই এ এন রিজিওনাল ফোরামে যোগদান করতে গিয়ে মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন সরাসরি উত্তর কোরিয়া-মায়ানমারের আঁতাত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পুরো বিষয়টাতে আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে অস্ট্রেলীয় মিডিয়ার প্রতিবেদনটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীন এবং অন্যান্য এশীয় দেশগুলি সাম্প্রতিক কালে উত্তর কোরিয়ার মালবাহী জাহাজগুলিকে রেঙ্গুনের নাম কাম-১ বন্দরে প্রবেশে সহায়তা করছিল। যেটা আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ ও সেই সঙ্গে একটি সন্দেহজনক মালবাহী জাহাজের বর্মা উপকূলে একদা পৌঁছানোর ঘটনার ওপর ছায়া ফেলেছিল। একমাস আগে জাপানী পুলিশ এক উত্তর কোরিয় ও দুই জাপানীকে বর্মায় বেআইনি চুম্বকীয় তরঙ্গ মাপার ডিভাইস(যার দ্বারা মিসাইল তৈরী হয়) পাচারের চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। এর পেছনে আমেরিকায় সায় আছে বলে মনে করছে সংবাদমাধ্যম।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com